Reg. No. DA.—142

এই সংখ্যায় আছে—

ইসলামের সর্ব্বসম্মত রূপ	১	পৃষ্ঠা
'কর্ম্মফল' ও "খোদাতালার অভিশাপ"....	২	"
বয়ানুল-কুরআন	৩-৫	"
তৌহিদের আহ্বান	৬	"
আমার শিক্ষা	৭-১২	"
নারী-পুরুষ	১৩-১৪	"
নবী-দিবসে	১৫	"
আখবার-আহমদীয়া	১৬	"

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের মুখপত্র।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর '৫৪ : আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৬১

নব পর্য্যায়—৮ম বর্ষ. | Fortnightly Ahmadi, September-October, '54 | ৯—১২ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ইসলামের সর্ব্বসম্মত রূপ

(ক)

আল্লাহ এক, কোরআন এক, রসুল এক, অথচ মুসলমানদের মধ্যে এত ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং পরস্পর এত ধর্ম্ম-কলহ কেন?

ইসলাম সমগ্র মানব জাতিকে এক করিতে চায়। মুসলমান সম্প্রদায়গুলিকে এক করা অসম্ভব হইবে কেন? কোরআন ও রসুলের প্রতি আস্থাবান লোকদিগকে এক করা যদি সম্ভব না হয়, কোরআনও রসুলের বিরোধী লোকদিগকে এক করা সম্ভব হইবে কিরূপে?

মৌলবী মৌলানা সাহেবান মনে করেন, বাহুবলই ইসলাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। তাহারা আশা করেন, শেষ যুগে হজরত ঈসা আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন এবং ইমাম মাহদীর সহিত একযোগে কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন; আল্লাহ তাহাদিগকে অজেয় শক্তির মালিক করিবেন; যে কেহ কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইতে অস্বীকার করিবে বা শিরক বিদায়াত করিবে, তাহারা তাহাদিগকে হত্যা করিবেন। কাফেরদের মাল এত অধিক তাহাদের হাতে আসিবে যে তাহা লইবার লোকেরও অভাব হইবে।

সমুদায় মুসলমান সম্প্রদায়কে এক করিতে হইলে এবং কাফের জাতিগণকে মুসলমান করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে এই জঘন্য ধারণা দূরীভূত করিতে হইবে। কোরআন এই ধারণার বিরোধী। কোরআন বলে—"লা ইকরাহ ফীদ্দীনে; কাদ তাবাইয়েনার রোশদু মিনাল গাইয়ে—ধর্ম্মে জোর জবরদস্তি নাই; জ্ঞান ও মূর্খতা সুস্পষ্ট"; "মান শাআ ফালইউমিন, অমান শাআ ফাল ইয়াকফুর—যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা ঈমান না আনুক"। কোন রক্তপিপাসু মাহদী বা ঈসার কল্যাণে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবে, কোরআন এ ধারণার ঘোর বিরোধী।

মানুষে মানুষে মিলন সম্ভব হয় চিন্তা বা আদর্শের একত্বের মধ্য দিয়া (community of thoughts & ideas)। পূর্ব্বসংস্কার মুক্ত হইয়া কোরআন বুঝিতে যত্নবান হওয়াই বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায় তথা সমগ্র মানব জাতির মিলনের উপায়।

(খ)

শিয়া সুন্নির তফসীরকে এবং সুন্নি শিয়ার তফসীরকে অবজ্ঞা করে। এই মনোবৃত্তি পরিহার করিতে হইবে। আরবী ভাষায় পণ্ডিত অমুসলমানের তফসীরও অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। বিভিন্ন তফসীরের যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করিয়া প্রকৃত তফসীর নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অপরের তফসীরের ভুল সপ্রমাণ করিবার জন্য যুক্তি, বিনয় ও শিষ্টাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী তফসীর লেখকগণের অন্ধভক্ত হইলে চলিবে না। তাহাদের কথাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং বিচারসহ না হইলে তাহাদের কথাকেও বর্জন করিতে হইবে। হাদীসকে কোরআনের অধীন জ্ঞান করিতে হইবে; কোরআনের কোন আয়াতের বিরোধী হাদীসকে কৃত্রিম মনে করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি হৃদয়ে মানবপ্রীতি রাখিতে হইবে; ভ্রান্ত ব্যক্তি ক্রোধের পাত্র নহে, কৃপার পাত্র। তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে হইবে। অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করাই নবীদের সুন্নাৎ; অত্যাচার বা উৎপীড়ন করা তাহাদের সুন্নাৎ নহে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আলেমদের অবস্থা দেখুন। তাহাদের কাহারও কোন কথাকে কেহ ভুল বলিলে ক্রোধে তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন; যুক্তির পরিবর্ত্তে কটূক্তি করা এবং আলোচনার পরিবর্ত্তে কুফরের ফতোয়া দেওয়া তাহাদের স্বভাব। হায় আলেম সমাজ, তাহাদের এই পতনের কারণেই ইসলামের সর্ব্বসম্মত রূপ ঢাকা পড়িয়াছে।

(গ)

আলেমদের ভুল সংশোধন করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নহে; আলেমদের সভা ডাকিয়াও সম্ভব নহে। আলেমদের সভায় দেখা যায় সত্য নির্ণয়ের চেষ্টার পরিবর্ত্তে হারজিতের প্রতিযোগীতা; শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা; সরকার হইতে ১৪৪ ধারার আদেশ। সভার শেষে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই বিজ্ঞাপন দেয়,—আমরা জিতিয়াছি, প্রতিপক্ষ পলায়ন করিয়াছে।

(ঘ)

ইসলামের সর্ব্বসম্মত রূপ দেখিবার তবে কি কোন উপায় নাই? 'ইসলাম' বলিতে সম্প্রদায় বিশেষের আলেমদের মত বুঝিলে এই কথাই বলিতে হয় যে এ স্বপ্ন পরিত্যাগ করুন; ইহা পূর্ণ হইবার নহে।

সমগ্র মানব জাতিকে একই ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে আসমান জমিনের মালিক আল্লাহ স্বয়ং ইসলামকে অবতীর্ণ করিয়াছেন। সুতরাং নিরাশ হইবারও কারণ নাই।

কোরআন করীমে আল্লাহ স্পষ্ট আদেশ দিয়াছেন, —"হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা মানিয়া চল আল্লাকে; আর মানিয়া চল এই রসুলকে এবং তোমাদের মধ্যে যিনি আদেশ দিতে অধিকারী তাঁহাকে"। এই আদেশ পালনে যত্নবান হওয়াই ইসলামে সর্ব্বসম্মত রূপ প্রতিষ্ঠার উপায়। এই আদেশ হইতে এ কথাও বুঝা যায় যে, ঈমানদারদিগকে আদেশ দিতে অধিকারী লোক সব সময়ই তাহাদের মধ্যে থাকিবেন। অন্যথা এ আদেশের সার্থকতা কি?

রসুলুল্লার স্পষ্ট হাদীস রহিয়াছে,—"মুসলমান জাতির কল্যাণের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় অবশ্যই আল্লাহ এমন ব্যক্তির উদ্ভব করিবেন, যিনি ইসলামকে পুনর্নবীভূত করিবেন"। আর একটি হাদীসে আছে,—"যে ব্যক্তি তাঁহার সমকালীন ধর্ম্ম নেতাকে চিনিয়া লইবে না সে অজ্ঞ থাকিয়া মরিবে"।

(ঙ)

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মীরজা গোলাম আহমদ আলায়হেচ্ছালামের দাবী এই যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আলেমদের ভুল দূরীভূত করিয়া ইসলামের খাটি রূপ দেখাইবার উদ্দেশ্যে এ যুগে আল্লাহ তাঁহাকে প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছিলেন; তিনি হাদীসের প্রতিশ্রুত 'হাকাম' ও 'আদেল'—ন্যায়বান মীমাংসাকারী। অহঙ্কার পরিহার করিয়া আলেমগণ যেদিন এই দাবীর বিচার করিতে অগ্রসর হইবেন, মুক্তবুদ্ধি মুসলমানগণ যেদিন আলেমদের সৃষ্ট ভুলের জাল ভেদ করিয়া এই দাবীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে যত্নবান হইবেন, ইসলামের সর্ব্বসম্মত রূপ সেইদিন প্রকটিত হইবে।

আল্লাহ সেই শুভ দিন নিকটবর্ত্তী করুন। আমীন

'কর্ম্মফল'

('যুগভেরী' ২৬শে আশ্বিন ১৩৬১ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

"বিংশ শতকের মাঝামাঝি আমারা এখন বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে জয় করিয়াছে বিপুলভাবে। তাই যে কোনও প্রাকৃতিক ব্যতিক্রম ও দুর্য্যোগকে আমরা বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখিতে চাই; এবং বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ নির্দ্ধারণ করি।

পূর্ব্ববঙ্গের এই অভূতপূর্ব্ব বন্যার কারণ নির্দ্ধারণেও আমরা বহুলাংশে বিজ্ঞানের উপর জোর দিতেছি বেশী। ভবিষ্যতে বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা-কল্পে বিশেষজ্ঞদের নিয়া কমিটি গঠনের জল্পনা কল্পনাও শুনা যাইতেছে। মনে হয় যে এই ভাবেই ভবিষ্যতের বন্যা প্রতিরোধে আমরা সফলকাম হইতে পারিব।

বন্যা প্রতিরোধের জন্য এভাবের প্রচেষ্টাকে আমরা একেবারে উড়াইয়া দিতে চাইনা। তবে ছবির অন্য একটা দিক আছে। তাহাও ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন বৈকি?

পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী দেশ আমেরিকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধকল্পে বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলের ব্যবস্থার কসুর করে নাই, তবুও প্রকৃতিদত্ত বন্যাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। মাসখানেক পূর্ব্বে আমেরিকাতে বন্যার ফলে বহুমূল্যের সম্পত্তি ও বহু হতাহতের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইরাণে কোন সময় বন্যার প্রকোপ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই কিন্তু এইবার অলৌকিক ঘটনার মত বন্যার ফলে ২০০০ লোকের প্রাণহানি হইয়াছে।

প্রমাণিত হইয়াছে যে শুধু চেষ্টা করিয়াই বন্যা বা যে কোন দুর্য্যোগকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। কারণ প্রকৃতি যার নির্দ্দেশে পরিচালিত হয় তার ক্ষমতা অসীম। মানুষের সসীম শক্তির দ্বারা প্রকৃতির দুর্ব্বার গতিকে রোধ করা যাইতে পারে না।

এইবার পূর্ব্ববঙ্গের বন্যাই শেষ নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ যেখানে কদাচিত বৃষ্টি হয় সেখানেও জল প্লাবনের তাণ্ডব লীলা চলিতেছে। সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদেও 'সয়লাব' হইয়া বিস্তর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মোটের উপর এইবার যে তাণ্ডবলীলা পাকিস্তানের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাকে শুধু প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা বলিলে ভুল করা হইবে। মোসলমান হিসাবে ইহাকে খোদাতায়ালার অভি-শাপ বলিয়া বিশ্বাস করাই ঠিক। কৃতকর্ম্মের ফল স্বরূপ এই অভিশাপ আমাদের প্রাপ্য।

আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে পাকিস্তানরূপ নিয়ামত দান করিয়াছেন। আমরা এই নিয়ামত পাইবার আগে কায়েদে আজম আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে পাকিস্তান হইবে ইসলামিক রাষ্ট্র; পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে ইসলাম নূতন ভাবে রূপ পরিগ্রহ করিবে। লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া পাকিস্তানকে ইসলামি হুকুমত করিবার ওয়াদা দিয়াছিলাম। কিন্তু দিন দিন আমরা

"খোদাতালার অভিশাপ"

ধর্ম্মীয় সাহিত্যে, এবং ধার্ম্মিকগণের বক্তৃতায় ও উপদেশে, 'খোদার আশীষ' ও 'খোদার অভিশাপ' কথা দুইটির ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, ধর্ম্ম চায় মানুষকে সুখ দুঃখের কারণ সম্বন্ধে অবহিত করিতে; দুঃখের পথ বর্জন করিয়া তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী করিতে; শুধু ইহলোকেই নয়, মৃত্যুর পরপারের অনন্ত জীবনেও।

শ্রদ্ধেয় সহযোগী 'যুগভেরী' তাঁহার 'কর্ম্মফল' নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এবারকার বন্যাকে বলিয়াছেন "খোদাতালার অভিশাপ"। প্রবন্ধটি মূলত আমাদের পছন্দ হইয়াছে এবং এই কারণেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

মাসখানেক পূর্ব্বে বাংলার প্রায় সকলেই যে এই বন্যাকে "খোদার অভিশাপ" মনে করিত, তাহাতে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু এখন? কুকুরের লেজ ভয়ের সময়ে সোজা হয়; ভয়ের কারণ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার স্বাভাবিক বক্রতা আবার ফিরিয়া আসে। বন্যা অতিবাহিত হওয়ার পর মনে হয় সকলেই আবার নিজ নিজ পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছে।

বন্যা, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ নূতন কথা নয়; কম বেশী সব সময়ই আছে এবং সব সময়ই থাকিবে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। এই সমুদায়কে বশে রাখার মত বিরাট জ্ঞান ও শক্তি এখনও মানুষের হয় নাই; ভবিষ্যতে কোন দিন হইবে বলিয়া কল্পনা করাও একটা দুঃসাহস বলিয়া মনে হয়। বিজ্ঞানের বহু উন্নতি হইয়াছে; আরও বহু উন্নতি হইতে থাকিবে; এখন যাহা মানুষের অসাধ্য, ভবিষ্যতে তাহা সহজ সাধ্য হইবে। কিন্তু এমন দিন কখনও আসিবে কি যখন বিজ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করিবে এবং কিছুই মানুষের অসাধ্য থাকিবে না?

যাহা কিছু মানুষের ধ্বংস ও দঃখদৈন্যের কারণ, তাহাই অভিশাপ। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে যাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটে, তাহারা ইহাকে আর কিছু মনে করিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতির ধ্বংসলীলাকে 'খোদার অভিশাপ' বলিতে আপত্তির কোনই কারণ নাই।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ যে শুধু ধ্বংসই করে তা নয়। এর আর একটা দিকও আছে। দুর্য্যোগের এই দানব আছে বলিয়াই ত মানুষ বুঝিতে পারে যে সে সর্ব্বেসর্ব্বা নহে; এই দানবকে জয় করিতে চেষ্টা করে বলিয়াই ত সে তাহার ক্ষুদ্র কাঠামের মধ্যে অফুরন্ত জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তির সন্ধান পায়; স্বীয় সসীম জ্ঞান ও সসীম শক্তির অনন্ত অভিসার তাহাকে এক অসীমের অস্তিত্বে বিশ্বাসী করিয়া তুলে। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক মাত্রই অসীমের সাধক; তাঁহারা তাঁকে ধর্ম্মের পারিভাষিক নাম দিক বা না দিক;— খোদা, আল্লাহ, গড, জিহোবা অথবা ঈশ্বর বলুক বা না বলুক।

'সহযোগী' বলেছেন,—আমরা "লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া পাকিস্তানকে ইসলামী হুকুমত করিবার ওয়াদা দিয়াছিলাম। কিন্তু দিন দিন আমরা প্রত্যেকেই ইসলামের আদর্শ হইতে সরিয়া পড়িতেছি। আমরা ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছি।" আমাদের "কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ এই অভিশাপ আমাদের প্রাপ্য।"

আমরা প্রত্যেকে না হইলেও অধিকাংশই বা আমাদের অনেকেই যে ইসলামের আদর্শ হইতে সরিয়া পড়িতেছি, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে এটা নূতন কথা নয়। ইসলামের প্রতি উদাসীনতা অতি পুরাতন। হালাকু খাঁ যখন বাগদাদ ধ্বংস করে, তখন জনৈক মনীষী বলিয়া-ছিলেন—'আমি আল্লার আদেশ শুনিতেছি—হে কাফেরগণ, এই পাপীদিগকে ধ্বংস কর'। আমাদের অবস্থা এখনও তদ্রূপ। পাকিস্তান হাসেল করিবার সময় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ইসলামী হুকুমতের কথা বলিয়াছিলাম; সত্যিকার কোন ওয়াদা করি নাই, সুতরাং উহা ভঙ্গও করি নাই। তথাকথিত ওয়াদার সময় যার মধ্যে যতটুকু ইসলাম ছিল, এখনও বোধহয় ততটুকুই আছে; অথবা অতি সামান্যই ইতরবিশেষ হইয়াছে। নেতৃত্বের আসন দখল করিবার বুলি হিসাবে তখন যেমন ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলিতাম, এখনও তেমনই 'নেজামে ইসলাম', 'ইসলামী জামায়াত' প্রভৃতি বুলি আওড়াইতেছি।

সহযোগীর উদ্দেশ্য মহৎ। মুসলমানদিগকে তিনি সত্যিকার মুসলমানরূপে দেখিতে চান। মুসলমান নামে যারা নিজেদের পরিচয় দেন, তাহাদের কেহই এ বিষয়ে অন্য কথা বলিবে না। তবে আসল সমস্যা এ নয় যে মুসলমান মুসলমান ছাড়া আর কিছু হইতে চায়। মুস্কিল এই যে ইসলাম বলিতে এখন একটা ধর্ম্মমত বুঝায় না। ইসলামের নামে বহু ধর্ম্মমত ও বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় দেখা যায়; একে অপরকে শুধু কাফের বলিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয় না; সম্ভব হইলে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করিতে প্রস্তুত। আহমদীয়া সম্প্রদায়কে নির্ম্মূল করিবার জন্য অনেকেই বদ্ধপরিকর। এইভাবে একে অন্যকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা না করিয়া ইসলামের সর্ব্বসম্মত রূপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই বুদ্ধিমান মুসলমানের কর্ত্তব্য। ইসলামের সর্ব্বসম্মত রূপ যেদিন আবিষ্কৃত হইবে, মুসলমান সেইদিন সত্যিকার মুসলমান হইতে পারিবে; সহযোগী যুগভেরীর উদ্দেশ্য সেইদিন সফল হইবে। —(সঃ আঃ)

প্রত্যেকেই ইসলামিক আদর্শ লইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছি; আমরা ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছি। দায়ে পড়িয়া মুখে ইসলামী হুকুমতের দোহাই দেই কিন্তু আজ আমাদের সবই অনৈসলামিক।

যার সঙ্গে আমরা ওয়াদা করিয়া ভঙ্গ করিতেছি তার শক্তি অসীম। তিনি 'আদা' ও 'ছামুদ' সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্ম্মের জন্য ধ্বংস করিয়াছেন, হজরত নূহ আঃএর কওমকে ডুবাইয়া মারিয়াছেন, বনি ইসরাইল ও হজরত 'লুত' আঃএর কওমকে শাস্তি দিয়াছেন।

উপরোক্ত জাতিসমূহের গল্প কোরআন শরীফে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন মনে করি না। উল্লেখিত জাতিসমূহের বিভিন্নরূপী পাপের সমাবেশ হইয়াছে আমাদের মধ্যে। তবুও তিনি আমাদিগকে ধ্বংস না করিয়া বিপদে ফেলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছেন। এখনও সতর্ক না হইলে আমাদের পতনকে কোন বৈজ্ঞানিক শক্তি রোধ পারিবে না—ইহা অবধারিত।"

বয়ানুল-কুরআন

পবিত্র কুরআনের সরল বঙ্গানুবাদ—সূরা বকর

—মুমতায আহমদ
মোবাল্লিগ, সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়া।

৮১। এবং তাহারা বলে কয়েকটা গণিত দিন ব্যতীত (দুযখের) অগ্নি আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করিবে না। (হে মহাম্মদ) তুমি বল তোমরা কি আল্লার নিকট হইতে কোন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছ? তবে ত আল্লাহ স্বীয় প্রতিজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করিবেন না। অথবা তোমরা আল্লার প্রতি এমন কথা আরোপ করিতেছ যাহার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই?

৮২। হাঁ যাহারা কোন প্রকার পাপ অর্জ্জন করিবে এবং তাহাদের পাপ তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে তাহারাই দুযখের অধিবাসী সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।

৮৩। এবং যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং অবস্থা ও সময়োপযোগী সৎকর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করিয়াছে তাহারাই বেহেস্তের অধিবাসী তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

১০ রুকূ চারি আয়াত ৮৪—৮৭

৮৪। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন আমরা ইছরাইলের সন্তানগণ হইতে কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলাম "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত করিও না। পিতা, মাতা, স্বজনগণ, এতামগণ ও দরিদ্রগণের হিতসাধন করিও, মানবজাতির উপকারজনক উত্তম কথা বলিও; নামাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখিও, জাকাত প্রদান করিও।" অতঃপর অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা এই প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলে এবং (এখনও) তোমরা উহার প্রতি পরাঙ্মুখ।

৮৫। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম যে তোমরা একে অন্যের রক্তপাত করিও না এবং স্বজাতিকে স্বীয় আবাস ভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিও না তখন তোমরা ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে এবং তোমরাই ইহার সাক্ষি।

৮৬। তৎপর সেই তোমরাই আবার স্বজনগণকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের একদল অপর দলকে তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতেছ এবং পাপ ও অত্যাচারের কাজে একে অপরকে সাহায্য করিতেছ এবং যখন তাহারা তোমাদের নিকট বন্দীরূপে আগমণ করে তখন তোমরাই আবার তাদের মুক্তিপণ দান করিয়া থাক অথচ তাহাদিগকে বহিষ্কার করাই তোমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কতকাংশের প্রতি ঈমান আনিয়া থাক এবং কতকাংশকে প্রত্যাখ্যান কর? অতএব তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা এবম্বিধ আচরণ করে তাহাদের এই পার্থিব জীবনে অপমান ব্যতীত অন্য কোন প্রতিফল নাই। অধিকন্তু কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে কঠোরতম শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত করা হইবে। এবং আল্লাহ কখনও তোমাদের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন।

৮৭। উহারাই ত তাহারা যাহারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করিয়াছে অতএব তাহাদের শাস্তিকে লঘু করা হইবে না এবং তাহারা সাহায্যও প্রাপ্ত হইবে না।

১১ রুকূ ১০ আয়াত ৮৮—৯৭

৮৮। এবং নিশ্চয়ই আমরা মূছাকে (তওরাৎ) কিতাব দান করিয়াছিলাম এবং তাহার পরেও তাহার অনুগমণকারী পয়গম্বরগণ পাঠাইয়াছি এবং মরিয়মের পুত্র ইসাকে অকাট্য প্রমাণ সমূহ দান করিয়াছি এবং তাহাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছি পরন্তু যখনই তোমাদের নিকট কোন নবী তোমাদের অভিপ্রায়ের বিপরীত বাণী সহ আগমণ করিয়াছে তখনই তোমরা অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছ ফলে একদলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছ এবং একদলকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছ।

৮৯। এবং তাহারা বলে আমাদের হৃদয়গুলি আবৃত (সুতরাং উহাতে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না তাহা নহে) বরং সমাগত নবীকে অস্বীকার করার ফলে আল্লাহ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন অতএব অতি অল্প লোকেই ঈমান আনয়ণ করিবে।

৯০। এবং যখন আল্লার নিকট হইতে তাহাদের সমীপে মহাগ্রন্থ (কোরআন) তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহার সত্যতার সাক্ষিরূপে আগমন করিল ইতিপূর্ব্বে তাহারা (আরবের) কাফিরগণের বিরুদ্ধে বিজয়ের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল অতঃপর যখন (সেই) পরিচিত কিতাব তাহাদের নিকট সমাগত হইল তাহারা উহাকে প্রত্যাখ্যান করিল অতএব কাফিরগণের উপর আল্লার অভিসম্পাত।

৯১। উহা কতই না মন্দ যাহার বিনিময়ে তাহারা আত্ম বিক্রয় করিল। তাহা এই যে আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার প্রতি ইচ্ছা তাঁহার অনুগ্রহ নাযিল করিবেন এই বিদ্বেষে তাহারা আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। অতএব তাহাদের উপর গযবের উপর গযব পুঞ্জীভূত হইয়াছে এবং এই প্রকার কাফিরদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি রহিয়াছে।

৯২। এবং তাহাদিগকে যখন বলা হয় আল্লাহ যাহা (মুহাম্মদের উপর) নাযিল করিয়াছেন তাহার প্রতি ঈমান আনয়ণ কর, তাহারা বলে আমাদের প্রতি যাহা নাযিল করা গিয়াছে (শুধু) তাহার প্রতি ঈমান আনয়ণ করিব এবং ইহা ছাড়া আর সমস্তকেই তাহারা অস্বীকার করিয়া থাকে যদিও উহা নিশ্চিত সত্য, তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহার সত্যতার সমর্থক। বল (হে মুহাম্মদ) যদি তোমরা মুমিন হইয়া থাকিতে তবে কেন ইতিপূর্ব্বে সমাগত নবিগণকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিলে?

৯৩। এবং সুনিশ্চিয়ই মূছা প্রমাণরাজি সহ তোমাদের নিকট আগমণ করিয়াছিল অতঃপর তাহার (তুর পর্ব্বতে) চলিয়া যাওয়ার পর তোমরা গোবৎসকে উপাস্য করিয়া নিয়াছিলে এবং তোমরা মহা পাপী হইয়াছিলে।

৯৪। এবং যখন তোমাদের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তুর পর্ব্বতকে তোমাদের (অবস্থান স্থলের) উপরিভাগে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলাম এবং (বলিয়াছিলাম) আমরা তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর। তাহারা (মুখে) বলিল শুনিলাম এবং (অন্তরে) বলিল অমান্য করিলাম এবং তাহাদের অবিশ্বাসের ফলে গোবৎস (পূজার আসক্তি) তাহাদের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

তুমি বল (হে মুহাম্মদ) যদি তোমরা (এই রকম) মুমিন হইয়া থাক তবে তোমাদের ঈমান তোমাদিগকে যাহা আদেশ দিতেছে তাহা কতইনা জঘন্য।

৯৫। বল (হে মুহাম্মদ) যদি অন্য মানুষ ব্যতীত শুধু তোমাদের জন্যই পরকালের (নিয়ামত) আল্লার নিকট (মনোনাত হইয়া) থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি (এই দাবীতে) তোমরা সত্যবাদী হও।

৯৬। এবং পূর্ব্ব হইতে তাহারা স্বহস্তে যাহা সঞ্চয় করিয়াছে তজ্জন্য তাহারা জীবনে কখনও উহা কামনা করিবে না এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের (কার্য্যকলাপ) সম্যক অবগত আছেন।

৯৭। নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে (পার্থিব) জীবনের জন্য সকল মানুষ হইতে অধিকতম আকাঙ্ক্ষী পাইবে এবং যাহারা অংশীবাদী তাহাদের চেয়েও। তাহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যদি তাহাকে সহস্র বৎসর আয়ু দান করা হইত। অথচ দীর্ঘায়ু দান করা হইলেও উহা তাহাকে (ইহ পরকালের) শাস্তি হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না এবং আল্লাহ তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্যক দেখিতেছেন।

১২ রুকু ৭ আয়াত ৯৮—১০৪

৯৮। বল যাহারা জিবরাঈলের শত্রু (তাহারা আল্লার শত্রু)। কারণ সে আল্লার আদেশে তোমাদের হৃদয়ে উহা (কুরআন) নাযিল করিয়াছে যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের সত্যতাস্বীকারকারী, সৎপথ প্রদর্শক এবং মুমিনগণের জন্য সুসংবাদবাহক।

৯৯। যাহারা আল্লার শত্রু এবং তাঁহার ফিরিস্তাগণ, রসুলগণ, জিবরাঈল ও মাকাঈলের শত্রু, নিশ্চয়ই আল্লাহ (এইরূপ) কাফিরদিগকে (তাহাদের শত্রুতার) সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবেন।

১০০। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ নাযিল করিয়াছি এবং (প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী) পাপীগণ ব্যতীত কেহই উহা প্রত্যাখ্যান করিবে না।

১০১। যখনই তাহারা কোন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে শুধু কি তাহাদের একদল উহা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে? বরং তাহাদের অধিকাংশই (এই প্রতিজ্ঞা পালনে) বিশ্বাস পোষণ করে না।

১০২। তাহাদের সঙ্গে যাহা আছে তাহার সত্যতা স্বীকারকারী মহানবী যখন আল্লার নিকট হইতে তাহাদের সমীপে আগমণ করিল যাহাদিগকে কিতাব দান করা হইয়াছে তাহাদের একদল তখন আল্লার কিতাবকে নিজদের পিঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল যেন তাহারা (এই রসুল সম্বন্ধে) কিছুই জানে না।

১০৩। অধিকন্তু কতিপয় শয়তান (দুষ্ট ইহুদি দলপতি) ছুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা প্রচারণা করিত এই ইহুদিরা (মুহাম্মদ (দঃ)এর বিরুদ্ধে) সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। অথচ ছুলাইমান কখনও ঈমানের পরিপন্থী আচরণ করেন নাই। পরন্তু ঐ শয়তানগুলিই কুফর গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিত এবং এই ইহুদিরা উহারও অনুসরণ করিতেছে যাহা বাবিলে হারুত ও মারুত ফিরিস্তা (তুল্য লোক) দ্বয়ের উপর নাযিল করা গিয়াছিল এবং উক্ত ফিরিস্তাদ্বয় কাহাকেও কিছু শিক্ষা দিত না যে পর্য্যন্ত না এই কথা বলিত আমরা (খোদার পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য) পরীক্ষাস্থল অতএব (তোমাদিগকে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা নবী বা তাঁহার স্থলবর্ত্তীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া) কাফের হইও না এবং সেই ইহুদিগণ উভয় ফিরিস্তা হইতে এমন সব কথা শিক্ষা করিত যাহার সম্বন্ধে তাহারা পুরুষ ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ করিত। এবং তাহারা আল্লার অনুমতি ব্যতীত (শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষয়ে অপপ্রয়োগ করিয়া) কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। এবং তাহারা উহাই শিক্ষা করিতে থাকে যাহা তাহাদের জন্য (আত্মিকভাবে) অপকারজনক এবং সামান্য উপকারজনকও নহে। এবং তাহারা নিশ্চয়ই একথা জানিত যে যাহারা ইহা গ্রহণ করে তাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নাই। এবং উহা কতইনা মন্দ যাহার বিনিময়ে তাহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছে। যদি তাহাদের জ্ঞান থাকিত (তাহা হইলে তাহারা মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারিত)

১০৪। এবং যদি তাহারা (সমাগত নবীর উপর) ঈমান আনয়ণ করিত এবং তাকওয়া গ্রহণ করিত তাহা হইলে আল্লার নিকট হইতে নিশ্চয় উত্তম পুরস্কারপ্রাপ্ত হইত। যদি তাহাদের জ্ঞান থাকিত (তাহা হইলে উহা বুঝিতে পারিত)।

১৩ রুকু ৯ আয়াত ১০৫—১১৩

১০৫। হে মুমিনগণ তোমরা "রায়িনা" বলিও না বরং "উনযুরনা" বলিও এবং (নবীর কথা) মনোযোগ দিয়া শুনিও এবং (বিদ্রূপকারী) কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (অবধারিত) আছে।

১০৬। গ্রন্থধারিগণের মধ্যে যাহারা কাফির হইয়া গিয়াছে এবং মুশরিকগণ (কেহই) ইহা পছন্দ করে না যে তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের প্রতি কোন মঙ্গল নাযিল করা হউক এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহার করুণা দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া লন! এবং আল্লাহ মহাঅনুগ্রহের মালিক।

১০৭। আমি যে কোন আয়াতকে রহিত করিয়া দেই অথবা ভুলাইয়া দেই তাহার চেয়ে অধিকতর উত্তম অথবা তাহারই মত অন্য আয়াত আনয়ন করিয়া থাকি। (হে প্রতিবাদকারি!) তুমি কি জান না যে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক শক্তিমান?

১০৮। তুমি কি অবগত নহ যে নিশ্চয় আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্যের একমাত্র সার্ব্বভৌম মালিক আল্লাহ এবং তোমাদের জন্য কোন বন্ধু নাই এবং অন্য কোন সাহায্যকারীও নাই।

১০৯। অথবা তোমরা কি তোমাদের রছুলকে সেইভাবে প্রশ্ন করিতে চাও যেভাবে ইতিপূর্ব্বে মুছাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল? এবং যেব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফর গ্রহণ করে নিশ্চয় সে সরল পথকে হারাইয়া ফেলে।

১১০। অধিকাংশ গ্রন্থধারী তাহাদের নিকট সত্য সুপ্রকাশিত হওয়ার পর ও নিজেদের বিদ্বেষবশতঃ ইচ্ছা পোষণ করে যে যদি তোমাদিগকে ঈমান আনয়ণ করার পর আবার কাফির করিয়া লইতে পারিত। পরন্তু তোমরা তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং ছাড়িয়া দাও যে পর্য্যন্ত আল্লাহ তাঁহার মীমাংসা নিয়া আসেন। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁহার অভিপ্রেত) প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ শক্তিমান।

১১১। এবং তোমরা নমাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও যাকাত প্রদান কর এবং তোমরা নিজেদের জন্য পূর্ব্ব হইতে যে পূণ্য সঞ্চয় করিবে তাহার (প্রতিদান) আল্লার সমীপে প্রাপ্ত হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্য্যকলাপ সম্যক দর্শন করিতেছেন।

১১২। এবং তাহারা বলে ইহুদী বা খৃষ্টান না হইলে কেহ কখনও বেহেস্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহা তাহাদের দুরাশা মাত্র। তুমি বল (হে মুহাম্মদ) যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের (দাবীর) প্রমাণ উপস্থিত কর।

১১৩। হাঁ যেব্যক্তি আল্লার সমীপে আত্ম সমর্পন করে এবং পুণ্য কার্য্যও করিতে থাকে তাহারই জন্য তাহার প্রভুর সকাশে পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে এবং তাহাদের (ভবিষ্যতের) কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা (অতীতের) কোন চিন্তাও করিবে না।

১৪ রুকূ ৯ আয়াত ১১৪—১২২

১১৪। ইহুদী জাতি বলে, খ্রীষ্টান জাতি কোন (প্রকার সত্য) বিষয়ের উপর অধিষ্ঠিত নহে এবং খ্রীষ্টান জাতি বলে, ইহুদী জাতি কোন (প্রকার সত্য) বিষয়ের উপর অধিষ্ঠিত নহে; অথচ তাহারা (উভয় জাতিই) তওরাৎ কিতাব পাঠ করিয়া থাকে। এইভাবে যাহারা (কিতাবের) কোন জ্ঞান রাখে না তাহারাও ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মত কথা বলে। অতঃপর তাহারা যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করিতেছিল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাদের মধ্যে সেগুলি মীমাংসা করিয়া দিবেন।

১১৫। যাহারা আল্লার মসজিদ সমূহে তাঁহার নামের যিকর করা হইতে বাধা প্রদান করে এবং ঐগুলিকে উৎসন্ন করার চেষ্টা করে তাহাদের চেয়ে অধিকতর অত্যাচারী আর কে হইতে পারে? এই সমস্ত লোকের পক্ষে (আল্লার ভয়ে) ভীত অবস্থায় ব্যতীত মর্সাজিদ সমূহে প্রবেশ করাই ত সমীচীন নহে। তাহাদের জন্য ইহকালে অপমান ও পরকালে ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে।

১১৬। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের একমাত্র মালিক আল্লাহ। অতএব তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও না কেন আল্লার অস্তিত্ব সেখানেই বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্বব্যাপী সম্যক জ্ঞানী।

১১৭। তাহারা আরও বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছে। (এই অপবাদ হইতে) তিনি পবিত্র বরং আকাশ সমূহ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তের মালিকই তিনি। সমস্তই তাঁহার হুকুমের তাবেদার।

১১৮। আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা তিনি যখন কোন বিষয়ের ইচ্ছা করেন তৎসম্বন্ধে বলেন হয়ে যা অমনি হইয়া যায়।

১১৯। অজ্ঞান লোকেরা বলে আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? এইভাবে তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরাও তাহাদের কথার অনুরূপ কথা বলিত। তাহাদের হৃদয় পরস্পর সদৃশ হইয়া গিয়াছে। যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে তাহাদের জন্য নিশ্চয় আমরা অনেক নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছি।

১২০। (হে মুহাম্মদ!) নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী (নবী)রূপে প্রেরণ করিয়াছি এবং দুযখের অধিবাসী সম্বন্ধে তোমার নিকট কোন জওয়াব চাওয়া হইবে না।

১২১। ইহুদী এবং খৃষ্টান জাতি কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি তাহাদের মতবাদের অনুগামী না হও। বল (হে মুহাম্মদ) আল্লার নিকট হইতে সমাগত হেদায়তই প্রকৃত হেদায়ত। এবং তোমার নিকট জ্ঞান আগমণ করার পরও যদি তুমি তাহাদের অন্যায় আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ কর তবে খোদার পক্ষ হইতে তোমার জন্য কোন বন্ধু থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীরও আসিবে না।

১২২। আমরা যাহাদিগকে (তওরাৎ) কিতাব দান করিয়াছি এবং তাহারা উহা যথার্থভাবে (মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া) পাঠ করে তাহারাই (সমাগত নবীর উপর) ঈমান আনয়ন করিবে। এবং যাহারা সমাগত নবীকে অস্বীকার করিবে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

১৫ রুকূ ৮ আয়াত ১২৩—১৩০

১২৩। হে ইছরাইলের সন্তানগণ (সেই কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদিগকে নিয়ামত দান করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে (সমসাময়িক) বিশ্ববাসীর উপর গৌরবান্বিত করিয়া দিয়াছিলাম।

১২৪। এবং সেই দিনের আযাব হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা কর, যেদিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না এবং কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ করা যাইবে না এবং কোন সুপারিশ কাহারও উপকার করিবে না এবং তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

১২৫। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীমকে তাঁহার প্রভু কতিপয় বাণী দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সে সেগুলি পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়াছিল। আল্লাহ বলিলেন আমি তোমাকে মানব সমাজের (আদর্শ) ইমাম করিয়া দিব। সে বলিল এবং আমার সন্তানগণ হইতেও (ইমাম করিও)। আল্লাহ বলিলেন আমার প্রতিশ্রুতি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য নহে।

১২৬। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন আমরা কাবাগৃহকে মানবের জন্য সম্মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলাম এবং (লোকগণকে বলিলাম) তোমরা "মকামে ইব্রাহীমকে" প্রার্থনাস্থলে পরিণত কর এবং ইব্রাহীম ও ইছমাঈলের প্রতি তাকীদ করিয়াছিলাম যে তোমরা আমার (এবাদতের) ঘরকে তওয়াফকারীগণ, এ'তেকাফকারীগণ ও রুকু-ছিজদাকারীগণের জন্য পরিশুদ্ধ করিয়া রাখিও।

১২৭। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল হে আমার প্রভো! তুমি এই শহরকে নিরাপত্তার স্থল করে দাও এবং ইহার অধিবাসীকে নানাবিধ ফল হইতে আহার্য্য দান কর যাহারা আল্লার উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহ বলিলেন এবং যাহারা অবিশ্বাস করিবে তাহাদিগকেও কিছুদিন ভোগ করিতে দিব অতঃপর তাহাদিগকে দুযখের শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব এবং তাহাদের এই পরিণাম কতইনা মন্দ।

১২৮। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইছমাঈল কাবাগৃহের দেওয়াল উঠাইতেছিল ও বলিতেছিল হে আমাদের প্রভো! আমাদের কার্য্যকে তুমি গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমিই (প্রার্থনা) শ্রবণকারী সম্যক জ্ঞানী।

১২৯। হে আমাদের প্রভো। তুমি আমাদিগকে তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী করিয়া লও এবং আমাদের সন্তানগণ হইতে এক আত্মসমর্পণকারী উম্মত গড়িয়া তোল এবং আমাদিগকে তোমার এবাদতের পদ্ধতি প্রদর্শন কর এবং আমাদের প্রতি সদয় হও; নিশ্চয় তুমিই অতি সত্বর প্রার্থনা মঞ্জুরকারী বারবার দয়াকারী।

১৩০। হে আমাদের প্রভো! তাহাদের মধ্যে তাহাদের জাতি হইতে একজন মহানবী প্রেরণ করিও যে তাহাদের নিকট তোমার নিদর্শনগুলি পাঠ করিবে তাহাদিগকে শরীয়ত এবং উহার তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবে; নিশ্চয় পরাক্রমশীল প্রজ্ঞাময়।

তৌহিদের আহ্বান

১০নং প্রচার পত্র

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের খৃষ্টান ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ সমিপেষু—

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

আমরা এখন আমাদের মাননীয় ভক্তিভাজন পবিত্র হজরত ঈসার (আঃ) কয়েকটি মূল্যবান শিক্ষার আলোচনা করিব। ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক তদীয় শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিন, যেন এই সব শিক্ষার নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি এবং আপন আপন জীবনে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখি। তিনি বলেন,—

"তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল 'তুমি ব্যভিচার করিও না' (যাত্রা পুস্তক ২০।১৩ পদ দেখুন)। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে সে তখনই মনে মনে তাহার প্রতি ব্যভিচার করিল।

"আর তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উপড়াইয়া ফেলিয়া দাও, কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তেমার পক্ষে ভাল।

"আর তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া দূরে ফেলিয়া দাও, কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়া অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।" (মথি ৫ম অধ্যায় ২৭—৩০ পদ দেখুন)।

"তোমরা শুনিয়াছ উক্ত হইয়াছিল 'চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু, দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত' (বাইবেল যাত্রা পুস্তক ২১—২৪ পদ দেখুন)। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না, বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও। আর যে তোমার সহিত বিচারস্থানে বিবাদ করিয়া তোমার আঙরাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে দাও। আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও।" (মথি ৫ম অধ্যায় ৩৮—৪২ পদ দেখুন)।

"তোমরা পৃথিবীতে আপনার জন্য ধন সঞ্চয় করিও না। এখানে ত কীটে ও মর্চ্যায় ক্ষয় করে, এবং এখানে চোরে সিঁদ কাটিয়া চুরি করে। কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর। সেখানে কীটে ও মর্চ্যায় ক্ষয় করে না, চোরেও সিঁদ কাটিয়া চুরি করে না। কারণ যেখানে তোমার ধন, সেইখানে তোমার মনও থাকিবে।" (মথি ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৯—২১ পদ দেখুন)।

"এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কি ভোজন করিব, কি পান করিব' বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা 'কি পরিব' বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না। ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় জিনিষ নয়? আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাহারা বুনেওনা, কাটেওনা, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করেনা। তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়ে থাকেন। তোমরা কি তাহাদের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ নও? অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইওনা যে, কি ভোজন করিব? কি পান করিব? বা কি পরিব? কেননা পর জাতীয়েরাই এ বিষয় চিন্তা করিয়া থাকে। তোমাদের স্বর্গীয় পিতাও জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্য তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না। কেননা কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট।" (মথি ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২৫-২৭ ও ৩৪ পদ দেখুন)।

আহা কি সুন্দর শিক্ষা বটে! এখন আমরা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, এই সব শিক্ষা সমগ্র জগতের খৃষ্টানগণের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছে কি? এই সব পরকালমুখী শিক্ষা লইয়া যদি কোন খৃষ্টিয়ান প্রচারক আমাদের নিকট আসতে পারেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সহিত নিশ্চয়ই সেইরূপ উত্তম ব্যবহার করিব, যেমন উত্তম ব্যবহার আমাদের মাননীয় পবিত্র হজরত ঈসা (আঃ) দেখাইয়াছেন। (যোহন ১৩ অধ্যায় ৫ পদ দেখুন)। যদি কাহারও ধর্ম্ম জীবন এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, এবং প্রাণে বল ও সাহস থাকে, তবে আসুন মাননীয় হজরত ঈসার সেই আদর্শ আপনাদের মধ্যে দেখিয়া জীবন সার্থক করি।

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, পাদরীদের প্রচারে প্রলোভিত হইয়া ভ্রান্ত হইবেন না। এই সব শিক্ষার মধ্যে সঠিক কি নিহিত আছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করুন। আমাদের সকলের পক্ষে সর্ব্ব প্রথমে ইহাই চিন্তা করা এবং অনুসন্ধান করে দেখা দরকার যে, এই প্রকার আদর্শ এই জগতে মানুষের মধ্যে চালু আছে কিনা। যদি থাকে তবে উহা গ্রহণ করা ভাল। আর যদি না থাকে, তবে উহা মানুষদিগকে শুনাইলে কোন ফল হইবে না। কারণ শিক্ষকের আদর্শ দেখিয়া ছাত্রগণ ধাবিত হয়; গুরুর আদর্শ দেখিয়া শিষ্যগণ ধাবিত হয়।

এই জগতে এমন কে আছেন যাহার হাত, পা, চক্ষু বিঘ্ন জন্মায় নাই? আমরা দেখিতে পাই যে এই পৃথিবীর মানুষদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য খৃষ্টানগণ যত বড় রকমের সাংঘাতিক মারণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ব্যবহার করে থাকেন, তেমন আর কোন জাতির মধ্যে নাই। জীবিকার বিষয়ে তাঁহারা যেমন সচেষ্ট তেমন আর কোন জাতি নাই। সুদের ব্যবসা, মাল কাটতীর ব্যবসা, এবং অন্যান্য সব দিক দিয়াই অন্য জাতিগণ তাঁহাদের চতুরতায় ও ফন্দিবাজীতে একেবারে পরাজিত। খৃষ্ট মহাগুরুর আদর্শ তাঁহাদের জীবনের আদর্শ কখনও নহে।

খৃষ্টিয়ান প্রচারকগণ ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন, মুসলীমগণ যদি তাহার শতাংশের এক অংশও ব্যয় করিতে পারিতেন তাহা হইলে পৃথিবীর মানুষ ঐ দিকে ধাবিত না হয়ে এই দিকেই ধাবিত হতো। মুসলীমগণ এখন হজরত যীশু খৃষ্টের মতই অসহায় এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত। অস্ত্রবল ও অর্থবল তাহাদের মোটেই নাই; কেবল আছে তাঁহাদের ঐ আদর্শ টুকু, যে আদর্শ মহাগুরুগণ বহন করে আসছেন! সেই জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই দেখা যায় যে, খৃষ্টান প্রচারকগণ রাজার হালে থেকেও তাহা করতে পারেন নাই, অবৈতনিক মুসলিম প্রচারকগণ দরিদ্র অবস্থায় থাকিয়া যাহা করিতে পারিতেছেন।

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, খৃষ্টিয়ান প্রচারকগণ মুসলীমগণের ধর্ম্ম আক্রমণ করিয়া যে সকল বই পুস্তক রচনা করেছেন, এখন তাহাদিগকে ঐ সব পুস্তকসহ অগ্রসর হইতে বলিলে কিম্বা তাঁহাদের লিখিত পুস্তকগুলির জবাব লিখিতভাবে দিতে চাহিলে তাঁহারা ঐ সব পুস্তক দেখাইতে রাজী নহেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, নিশ্চয়ই ঐ সব লেখায় মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা মুসলীম মিশনারীগণের নিকট ধরা পড়িবে ভয়ে তাঁহারা অগ্রসর হইতে রাজী নহেন।

ইসলাম বলছে, হে মানবজাতি, নিশ্চয়ই তোমাদের জীবন ও মরণের সর্ব্বসময়েই আমি তোমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছি; আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাগমণ করিতে হইবে। লোভী ও পাপাচারী না হইয়া সেই আদর্শ বহন করিতে করিতে তোমরা আমার দিকে অগ্রসর হও, যে আদর্শ পূর্ব্ববর্ত্তী মহাগুরুগণ বহন করিয়াছেন। পবিত্র কোরাণ ঘোষণা করছে—

Say ye, We belive in God and what is sent down unto us, what was sent down unto Abraham and Ismail, and Isaac, Jacob, and the tribes and what was given unto Moses and Jesus and what was given to the prophets from their Lord; We make no distinction between any one of them, and we are unto Him resigned. (Holy Quran ch II : verse 130)

হে আমাদের খৃষ্টিয়ান ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! এখন চিন্তা করিয়া মন স্থির করুন, বাস্তবিকই খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে মহাগুরু হজরত যীশু খৃষ্টের সেই আদর্শ আছে কিনা।

ডাঃ হোসেন উদ্দিন খান,
অবৈতনিক ইসলাম প্রচারক,
ইসলাম মিশন, ষ্টেশন রোড, ফরিদপুর।

আমার শিক্ষা

(কিস্তিয়ে নূহ হইতে)

নিশ্চিত জ্ঞান পরম সম্পদ

হে তোমরা যাহারা খোদাকে চাও, কাণ খুলিয়া শুন ;—নিশ্চিত জ্ঞান পরম সম্পদ। নিশ্চিত জ্ঞান পাপ হইতে দূরে রাখে ; নিশ্চিত জ্ঞান পুণ্য করিবার শক্তি দেয় ; নিশ্চিত জ্ঞান মানুষকে খোদার প্রেমিক করিয়া তুলে।

নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতিরেকে পাপ পরিহার করিতে পার কি ? নিশ্চিত জ্ঞানের প্রভাবে ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের প্রভাব খর্ব্ব হইতে পারে কি ? নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতিরেকে শান্তি লাভ করিতে পার কি ? নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতিরেকে সত্যিকার পরিবর্ত্তন আসিতে পারে কি ? নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতিরেকে সুখী হইতে পার কি ?

আকাশের নিম্নে এমন কোন 'প্রায়শ্চিত্ত' অথবা 'বিনিময়' নাই যাহা তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিতে পারে। মরিয়ম পুত্র ঈসার কল্পিত 'রক্তদান' পাপ-মুক্ত করিতে পারে না। হে খৃষ্টানগণ, এত বড় মিথ্যা কথা বলিও না, ধরিত্রী খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে। মুক্তির জন্য যীশুও নিশ্চিত জ্ঞানের প্রত্যাশী ছিলেন। নিশ্চিত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াই তিনি মুক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

ধিক খৃষ্টানদের প্রতি। যীশুর রক্তদানে বিশ্বাসী হইয়া আমরা পাপ-মুক্ত হইয়াছি, এই মিথ্যা দাবী করিয়া তাহারা জগদ্বাসীকে প্রতারণা করিতেছে। তাহারা আপাদ মস্তক পাপের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। তাহারা জানে না খোদা কে। তাহারা খোদার প্রতি উদাসীন। তাহাদের মস্তিষ্ক মদের নেশায় ভরপুর। ঐশীপ্রেমের পবিত্র নেশা তাহারা জানে না। এই নেশা আকাশ হইতে আসে। পবিত্র জীবন যাপনে সক্ষম করিয়া এই নেশা মানুষকে খোদার সঙ্গ দান করে। এই সৌভাগ্য হইতে তাহারা বঞ্চিত রহিয়াছে।

স্মরণ রাখিও, নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতিরেকে পাপ-মুক্ত হওয়া সম্ভব নহে ; পবিত্র আত্মার শক্তি লাভ করাও সম্ভব নহে। ধন্য সেই ব্যক্তি, যে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করিয়াছে ; সে খোদাকে দেখিতে পাইবে। ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে ; সে পাপ-মুক্ত হইবে। যেদিন তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানরূপ পরম সম্পদের অধিকারী হইতে পারিবে, সেই দিন তোমরাও ধন্য হইবে। সেই দিন তোমাদের পাপপ্রবণতার অবসান ঘটিবে।

পাপ এবং নিশ্চিন জ্ঞান একত্র থাকিতে পারে না। যে গর্ত্তে বিষধর সাপ দেখিতে পাও, উহার মধ্যে হাত দাও কি ? আগ্নেয়গিরী যেখানে অগ্নি বর্ষণ করিতেছে, যেখানে বজ্রপাত হইতেছে, হিংস্র বাঘ যেখানে আক্রমণ করে, প্লেগ মহামারী যেস্থানকে উজাড় করিতেছে, তোমরা সেইস্থানে দাঁড়াও কি ? সাপ, বাঘ, বজ্রপাত বা প্লেগ সম্বন্ধে তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান আছে। খোদা সম্বন্ধে তদ্রূপ নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে তাঁহার অনুগত না হওয়া বা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা অসম্ভব।

হে জনমণ্ডলী, তোমরা যাহারা পুণ্যশীল ও সত্যাশ্রয়ী হইবার জন্য আহূত হইয়াছ, নিশ্চয় জানিও, যেদিন তোমাদের অন্তর নিশ্চিত জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে, সেইদিন তোমরা খোদার প্রতি আকৃষ্ট হইবে ; সেই দিন তোমাদের পাপের কালিমা দূরীভূত হইবে। হয় ত তোমরা মনে কর যে খোদা সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান তোমাদের আছে। ইহা তোমাদের ভুল ধারণা। নিশ্চিত জ্ঞান তোমাদের নাই। নিশ্চিত জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল তোমাদের মধ্যে দেখিতে পাই না। তোমরা পাপ পরিহার কর না ; পাপকে ততটা ভয় কর না ; পুণ্য কাজে ততটা উদ্যম দেখাও না। তোমরা নিজেরাই চিন্তা করিয়া দেখ, গর্ত্তে বিষধর সাপ আছে জানার পর উহার মধ্যে হাত দিবে কি ? খাদ্যে বিষ মিশান আছে জানার পর উহা খাইবে কি ? ভুলেও হিংস্র ব্যাঘ্র-সঙ্কুল জঙ্গলে প্রবেশ করিবে কি ? খোদা শাস্তি দিবেন, নিশ্চিতভাবে এই জ্ঞান থাকিলে তোমাদের হাত, পা, চোখ, কাণ পাপের দিকে ধাবিত হইতে পারে কিরূপে ? তোমরা জলন্ত অনলকুণ্ডে ঝাপাইয়া পড় কি ? পাপপ্রবণতা নিশ্চিত জ্ঞানকে পরাভূত করিতে পারে না। শয়তান নিশ্চিত জ্ঞানের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া আসিতে পারে না। নিশ্চিত জ্ঞানের প্রাচীর আকাশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

নিশ্চিত জ্ঞানের প্রভাবেই পবিত্র ব্যক্তিগণ পবিত্র হইয়াছেন। নিশ্চিত জ্ঞান দুঃখ বরণ করিবার শক্তি দেয় ; সিংহাসন ছাড়িয়া রাজাধিরাজকে ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইতে সক্ষম করে। নিশ্চিত জ্ঞান দুঃখকে সহজ করিয়া দেয়। নিশ্চিত জ্ঞান খোদাকে দেখাইয়া দেয়। 'প্রায়শ্চিত্ত' অথবা 'বিনিময়' মানুষকে পবিত্র করিতে পারে না। পবিত্রতা আসে নিশ্চিত জ্ঞানের পথে। পাপ দূরীভূত হয় নিশ্চিত জ্ঞানের পথে। নিশ্চিত জ্ঞান খোদা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেয় ; খোদার প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় মানুষকে ফেরেস্তা হইতেও শ্রেষ্ঠতর করিয়া তুলে।

যে ধর্ম্ম নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না তাহা মিথ্যা। যে ধর্ম্ম নিঃসন্দেহভাবে খোদাকে দেখাইয়া দিতে পারে না, তাহা মিথ্যা। যে ধর্ম্মে খোদা সম্বন্ধে পুরাতন কাহিনী বৈ আর কিছুই নাই তাহা মিথ্যা। খোদা অতীতে ছিলেন, এখনও আছেন। তাঁহার শক্তিমালা অতীতে ছিল, এখনও আছে। তাঁহার চিহ্ন প্রকাশের ক্ষমতা অতীতে ছিল, এখনও আছে। যে ধর্ম্মে 'অলৌকিক ব্যাপার' ও ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত পুরাতন কাহিনী বই আর কিছুই নাই, উহা মরিয়া গিয়াছে। তোমরা পুরাতন কাহিনীতে সন্তুষ্ট থাক কেন ? যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খোদার আত্মপ্রকাশ দেখা যায় না, যে সম্প্রদায়কে খোদা স্বহস্তে পবিত্র করিতেছেন না, উহা মৃত।

দৈহিক উপভোগের সামগ্রী দেখিলে মানুষ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। আত্মিক জীবনের আস্বাদন পাইলে মানুষ অবিকল তদ্রূপই খোদার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে ; খোদার আকর্ষণে বিমোহিত হইয়া পড়ে ; অপর সব কিছু তখন তাহার নিকটে অতি তুচ্ছ মনে হইতে থাকে। খোদার শাসন ও শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাপ-প্রবণতার অবসান ঘটে। খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞতাই পাপপ্রবণতার মূল। খোদা সম্বন্ধে যাহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানও হইয়াছে, পাপকে ভয় না করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। বাসস্থানের দিকে প্রবল বন্যা আসিতেছে, গৃহের চতুর্দ্দিকেই আগুন লাগিয়াছে এবং অল্পেই ঘরে আগুন লাগিবে, নিশ্চিতভাবে এই জ্ঞান হওয়ার পরেও কোন গৃহস্বামী তাহার গৃহে থাকিবে কি ? তোমরা তোমাদের ভীষণ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আছ কি প্রকারে ?

চক্ষু খুলিয়া দেখ, খোদার বিধান বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে। মূষিকের ন্যায় অধোগামী হইও না। কবুতরের ন্যায় ঊর্দ্ধগামী ও আকাশচারী হও। তোমরা পাপ পরিহারের অঙ্গিকার করিয়াছ। এই অঙ্গিকারের পরে আবার পাপে লিপ্ত হইও না। খোসা বদলাইবার পরেও সাপ সাপই থাকে। তোমরা সাপের অনুকরণ করিও না। মৃত্যুকে স্মরণ রাখিবে। ক্রমাগত উহা তোমাদের নিকটতর হইতেছে। পবিত্র হইতে চেষ্টা কর। পবিত্র ব্যক্তিগণই পবিত্র স্বত্তাকে লাভ করিতে পারে।

পবিত্রতা লাভ করা কিরূপে সম্ভব ? কোরআন করীমে খোদা স্বয়ং এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন—"অস্তায়ীনু বিচ্ছবরে অচ্ছালাতে—নামাজ ও অধ্যবসায় সহকারে খোদার সাহায্য চাও" (২ : ৪৫)। 'নামাজ' কি ? 'নামাজ' বলিতে 'তসবীহ', 'তহমীদ', 'তকদীস', 'ইস্তিগফার' ও 'দরূদ' সহকারে সকাতর প্রার্থনা বুঝায়*। তোমরা যখন নামাজ পড়, অজ্ঞ লোকদের ন্যায় প্রথা

---

*অনুবাদকের নিবেদন—'তসবীহ', 'তহমীদ' 'তকদীস', 'ইস্তিগফার' ও 'দরূদ' ইসলামের ধর্ম্মীয় পারিভিষিক শব্দ। শাব্দিক অনুবাদে অর্থবিকৃতির সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে অনুবাদকের ব্যাখ্যাকে মূল পুস্তকের অংশ মনে করিয়া পাঠকগণ ভুল করিতে পারেন। এই কারণে এই পাঁচটি শব্দের অনুবাদ করিতে বিরত রহিলাম।

'সুবহান আল্লাহ' বলিলে 'তসবীহ' করা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে খোদা কখনও তাঁহার কোন গুণ বা রীতির বিরোধী কাজ করেন না। 'আলহামদু লিল্লাহ' বলিলে 'তহমীদ' করা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে খোদা সর্ব্বগুণাকর। আল্লাকে 'কুদ্দুস' বলিলে 'তকদীস' করা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে খোদা পবিত্র ; পবিত্র না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। "আস্তাগফিরুল্লাহ—আমি আল্লার আশ্রয় চাই"—এই কথা বলাকে 'ইস্তিগফার' করা বলে। জ্ঞানে ও শক্তিতে মানুষ অতি দুর্ব্বল, এই কথা স্মরণ করিয়া খোদার নিকটে জ্ঞান ও শক্তি চাওয়াকে 'ইস্তিগফার' বলা হয়। 'দরূদ' বলিতে রসুল ও তাঁহার উম্মতের কল্যাণ প্রার্থনা করা বুঝায়। ইসলাম ও মুসলমান জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বদ্ধবান থাকা দরূদের তাৎপর্য্য। —অনুবাদক।

হিসাবে আরবী শব্দগুলি উচ্চারণ করাকে যথেষ্ট মনে করিও না। এইরূপ নামাজ অন্তঃসারশূন্য। খোদার কথা কোরআনে এবং রসুলের কথা হাদীসে যে সকল প্রার্থনা আছে, নামাজের মধ্যে তদ্ব্যতীত নিজ নিজ ভাষায়ও প্রার্থনা করিবে, যেন প্রার্থনার প্রভাবে তোমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়।

পাঁচবারের নামাজ তোমাদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার চিত্র। বিপদের সময় প্রকৃতিগতভাবে তোমরা পাঁচটি অবস্থার সম্মুখীন হও।

(১) তোমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে প্রথম ব্যাঘাত সৃষ্টি করে আসন্ন বিপদের সংবাদ। বিপদের সংবাদ আদালতের ওয়ারেন্ট সদৃশ। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাতের সূচনাকে সূর্য্যের ঢলিয়া পড়ার সময়ের সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে। তোমাদের এই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সূর্য্য ঢলিয়া পড়ার সময়ে জোহরের নামাজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) তোমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন আসে বিপদ যখন নিকটে আসে; ওয়ারেন্টের পর গ্রেফতার করিয়া যখন তোমাদিগকে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। ভয়ে তখন তোমাদের রক্ত শুকাইয়া যায়; তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের শেষ আলোক রেখা প্রায় বিলীন হইয়া যায়। তোমাদের এই দ্বিতীয় অবস্থা সূর্য্যোস্তের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের সদৃশ; যখন সূর্য্যের কিরণ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং বুঝা যায় যে অবিলম্বে উহা অস্তমিত হইবে। তোমাদের এই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আছরের নামাজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৩) তোমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে তৃতীয় পরিবর্ত্তন আসে যখন তোমাদের বিপদমুক্তির সমস্ত আশা নষ্ট হইয়া যায়; বিরুদ্ধ প্রমাণ হইয়া যাওয়ার পর যখন তোমাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়; হতবুদ্ধি হইয়া যখন তোমরা নিজদিগকে কয়েদী মনে করিতে থাক। সূর্য্যাস্তের পর আলোক যখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়, তোমাদের এই তৃতীয় অবস্থা তৎসদৃশ। তোমাদের এই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মগরেবের নামাজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৪) তোমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে চতুর্থ পরিবর্ত্তন আসে যখন বিপদের গাঢ় অন্ধকার তোমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে; সাক্ষি প্রমাণের পর যখন তোমাদের প্রতি দণ্ডের আদেশ হইয়া যায়; জেলখানায় পৌছাইবার জন্য যখন তোমাদিগকে পুলিশের হাতে সোপর্দ্দ করা হয়। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের সহিত তোমাদের এই অবস্থার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। তোমাদের এই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এশার নামাজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৫) অতঃপর দীর্ঘ সময় তোমরা বিপদের এই ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া থাক। পরিশেষে খোদার কৃপা তোমাদের জন্য উদ্বেলিত হইয়া উঠে; তোমাদের মুক্তি-উষা আবার ফিরিয়া আসে; সূর্য্যের উদয়ে দিঙমণ্ডল আবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই অবস্থায় প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ফজরের নামাজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তোমাদের প্রকৃতিগত পাঁচটি পরিবর্ত্তনের প্রতি-দৃষ্টি রাখিয়া তোমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য খোদা পাঁচ নামাজ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যদি বিপদ হইতে বাঁচিতে চাও, তবে পাঁচবারের নামাজ ছাড়িও না। নামাজ তোমাদের বিপদের সময়কার আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের প্রতিচ্ছবি। নামাজ আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায়। তোমরা জাননা আগামী কাল তোমাদের ভাগ্যে কি আছে। আগামী কাল আসিবার পূর্ব্বেই তোমাদের প্রভুর নিকটে বিনীত প্রার্থনা জানাও, আগামী কাল যেন তোমাদের জন্য আশীষ ও কল্যাণের দিন হয়।

প্রধানদের প্রতি

হে আমীর সম্প্রদায়, হে সম্রাটগণ, হে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ, আপনাদের মধ্যে অল্প লোকই খোদাকে ভয় করিয়া সৎপথে চলেন। আপনাদের অধিকাংশ লোকই পার্থিব সম্পদ ও প্রতিপত্তির নেশায় বিভোর থাকেন এবং এই নেশার মধ্যেই তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়। মৃত্যুকে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন।

যে আমীর ব্যক্তি খোদার প্রতি উদাসীন, এবং নামাজ অবহেলা করেন, তাঁহার অধীন ভৃত্য ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহারা তাঁহার অনুকরণ করে, তাহাদের পাপও তাঁহার স্কন্ধে চাপিবে। যে আমীর ব্যক্তি সুরা করেন করেন, তাঁহার অধীন ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা সুরা পান করে তাহাদের পাপও তাঁহার স্কন্ধে চাপিবে। হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ, এই পৃথিবী চিরকাল থাকিবার জায়গা নহে। অতএব সতর্ক হউন; অসঙ্গত আচরণ হইতে বিরত থাকুন; মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করুন। শুধু মদই মানুষের সর্ব্বনাশের কারণ নহে। আফিং, গাঁজা, ভাং, তাড়ি প্রভৃতিও সর্ব্বনাশের কারণ। যে কোন মাদক দ্রব্যের অভ্যাস মস্তিষ্কের বিকার সৃষ্টি করে এবং পরিণামে সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই সমুদায় পরিহার করুন। আমি বুঝিতে পারি না কেন লোকে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে। পরকালের শাস্তি ত আছেই, ইহার কুফলে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোকের অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে*। মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করুন, আপনাদের আয়ু বৃদ্ধি হইবে এবং আপনারা খোদার আশীষ লাভ করিবেন।

অতিরিক্ত ভোগবিলাসের জীবন একটা অভিশাপ। খোদার প্রতি এবং তাঁহার সৃষ্টির কল্যাণের প্রতি উদাসীনতা আর একটা অভিশাপ।

*মদ ইউরোপের লোকদের বহু অনিষ্ট করিয়াছে। হজরত ঈসা আঃ মদ ব্যবহার করিতেন, সম্ভবতঃ কোন ব্যাধির কারণে বা পুরাতন অভ্যাস বশতঃ। এই কারণে তাহারা মদ খায়। কিন্তু হে মুসলমানগণ, তোমাদের নবী আঃ যাবতীয় মাদক দ্রব্য হইতে দূরে থাকিতেন। তোমরা কাহার আদর্শ অনুসরণ করিতেছ? ইঞ্জিলের ন্যায় কোরআন মদকে বৈধ সাব্যস্ত করে নাই! কোন দলীলের সাহায্যে মদকে তোমরা বৈধ সাব্যস্ত কর? মরিতে হইবে নাকি?

খোদার অধিকার এবং তাঁহার সৃষ্টির অধিকার সম্বন্ধে প্রত্যেক মানুষকেই জবাবদিহি করিতে হইবে। এই জবাবদিহি ধনী সম্প্রদায়েরই অধিক। বড়ই হতভাগ্য সেইব্যক্তিগণ, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই চরম জ্ঞান করিয়া যাহারা খোদার বিরুদ্ধাচরণ করে; বৈধ বস্তুর ন্যায় খোদার নিষিদ্ধ বস্তুকে যাহারা অবাধে ব্যবহার করে; ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া যাহারা কাহাকে গালি দেয়, কাহাকে আহত করে, কাহাকেবা নিহত করিতে উদ্যত হয়; কামপ্রবৃত্তিকে যাহারা নির্লজ্জতার শেষ সীমায় পৌছাইয়া দেয়। আমরণ ইহারা প্রকৃত সুখে বঞ্চিত থাকে*।

প্রিয় বন্ধুগণ, অল্প দিনের জন্যই আপনারা এই জগতে আসিয়াছেন। উহারও একটা দীর্ঘ অংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। স্বীয় প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিবেন না। শক্তিশালী মানবীয় রাষ্ট্রের ক্রোধেও যখন আপনাদের পতন ঘটিতে পারে, খোদাকে ক্রুদ্ধ করিয়া আপনারা বাঁচিয়া থাকিতে পারেন কিরূপে? খোদার হুজুরে যদি আপনারা ধর্ম্মপরায়ণ বিবেচিত হন, কেহই আপনাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। স্বয়ং তিনিই আপনাদিগকে রক্ষা করিবেন। আপনাদের সংহারপ্রয়াসী শত্রু আপনাদিগকে ধরিতে অক্ষম থাকিবে। খোদা ক্রুদ্ধ হইলে কেহই আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। শত্রুর ভয়ে বা অন্য বিপদের কারণে আপনাদের জীবন অশান্তিময় হইয়া পড়িবে; আপনাদের শেষ দিনগুলি মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ ও দুঃখের মধ্যে অতিবাহিত হইবে। যাহারা খোদার অনুগত, খোদা তাহাদের পৃষ্ঠপোষক। অতএব খোদার দিকে আসুন; তাঁহার সহিত বিরোধ পরিহার করুন; তাঁহার আদেশ পালনে শিথিলতা পরিত্যাগ করুন; কাজে বা কথায় তাঁহার সৃষ্টির প্রতি অত্যাচার করিবেন না; আকাশের অভিসম্পাতকে ভয় করুন। ইহাই আপনাদের মুক্তির পথ।

আলেমদের প্রতি

হে ইসলামের আলেমগণ, আমার দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিবার জন্য অধীর হইবেন না। নিগূঢ়

*যে ব্যক্তি মানব জাতির প্রতি ক্রোধের অনুশীলন করিতে থাকে, খোদার ক্রোধ তাহাকে ধ্বংস করে। 'কেয়ামতের' দিন প্রত্যেক পাপীই ঐশী ক্রোধের বিষময় ফল ভোগ করিবে। এই পৃথিবীতে যাহারা ক্রোধের অনুশীলন করে, ঐশী ক্রোধ এই পৃথিবীতেই তাহাদিগকে ধ্বংস করে।

সুরা ফাতেহার 'মগজুব আলাইহিম' (অভিশাপ-গ্রস্ত) শব্দে ইহুদি জাতির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহুদি জাতির তুলনায় খৃষ্টান জাতি ক্রোধের অনুশীলন করে নাই। এই কারণে, সুরা ফাতেহায় তাহাদিগকে 'মগজুব আলাইহিম' না বলিয়া 'জাল্লীন' বলা হইয়াছে। 'জাল্লীন' অর্থ (১) পথভ্রষ্ট, (২) বিলীন। আমার মতে দ্বিতীয় অর্থে তাহাদের সম্বন্ধে একটি সুসংবাদ রহিয়াছে; 'শিরক' এবং অনাচার পরিহার করিয়া মুসলমানদের ন্যায় তাহারাও একেশ্বরবাদী হইবে; মিথ্যা ধর্ম্মের বন্ধন মুক্ত হইয়া পরিশেষে তাহারা ইসলামে বিলীন হইবে।

সত্য বুঝিতে সময় আবশ্যক ; শুনা মাত্রই প্রত্যাখ্যান করিবেন না। ইহা ধর্ম্মভীরু লোকের রীতি নহে। আপনাদের মধ্যে যদি কোনরূপ ভুলভ্রান্তিই না থাকিত, কোন কোন হাদীসের আপনারা যদি ভুল অর্থ না করিতেন, তবে মীমাংসাকারীরূপে মসীহ মওউদের আগমণের আবশ্যকতা কি ?

ইহুদি জাতির উদাহরণ আপনাদের সামনে রহিয়াছে। তাহারা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, আপনারাও অবিকল সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন ; তাহারা যে কথার উপরে জোর দিয়াছিল, আপনারাও সেই কথার উপরে জোর দিতেছেন। আপনারা ঈসা আলায়হেচ্ছালামের দ্বিতীয় আগমণ প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইহুদি জাতি ইলিয়াস আলায়হেচ্ছালামের দ্বিতীয় আগমণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা বলিত, ইলিয়াস নবীকে আকাশে উত্তোলন করা হইয়াছিল ; তিনি আবার আসিবেন এবং তাঁহার আগমণের পর প্রতিশ্রুত মসীহ আসিবেন ; ইলিয়াস নবীর পুনরাগমণের পূর্ব্বে যে কেহ প্রতিশ্রুত মসীহ হইবার দাবী করে করে সে মিথ্যাবাদী। শুধু হাদীসের উপরে নির্ভর করিয়াই তাহারা এই কথা বলিত না ; এই কথার সপক্ষে 'মালখি' নবীর প্রতি অবতীর্ণ ঐশীগ্রন্থ হইতেও তাহারা প্রমাণ উপস্থিত করিত।

ইলিয়াস আসিলেন না ; ঈসা আঃ ইহুদি জাতির প্রতিশ্রুত মসীহ হইবার দাবী করিলেন। প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইলিয়াস নবী আকাশ হইতে অবতরণ করিবে বলিয়া ইহুদি জাতি যে ধারণা পোষণ করিতেছিল, তাহা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হইল। ইলিয়াস নবীর পুনরাগমণ সংবাদের অর্থ এই দাঁড়াইল যে ইলিয়াসের শক্তি ও পরাক্রম (spirit and power) সহকারে অপর কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হইবেন। আপনারা যাহার পুনরাগমণ প্রতীক্ষা করিতেছেন, সেই হজরত ঈসা আঃ স্বয়ং পুনরাগমণের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহুদি জাতি যে ভুল করিয়াছিল, আপনারা সেই ভুলই করিতেছেন কেন? দেশে হাজার হাজার ইহুদি আছে ; তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, তাহারা যে কথা বলিয়াছিল, আপনারাও সেই কথাই বলিতেছেন কিনা। তাহারা মনে করিত, খোদা ইলিয়াস নবীকে আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন। আপনারা মনে করেন, খোদা ঈসা নবীকে আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন। খোদা তাহাদের ধারণা পূর্ণ করেন নাই ; আপনাদের ধারণা পূর্ণ করিবেন বলিয়া আশা করেন কি প্রকারে?

আপনারা হজরত ঈসার আকাশ হইতে অবতরণের প্রতীক্ষা করিতেছে। আকাশ হইতে অবতরণের যে ব্যাখ্যা স্বয়ং তিনিই করিয়া গিয়াছেন, আপনারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন কেন? 'ইয়াহিয়া নবীই সেই ইলিয়াস, যাহার আসিবার কথা ছিল,' এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া ইহুদি জাতির পুরাতন ধারণাকে তিনি ধূলায় মিলাইয়া দিয়াছিলেন। দেশে লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান আছে ; ইঞ্জিলও আছে। সন্দেহ থাকিলে খৃষ্টানদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, এ কথা সত্য কি না।

এই ব্যাখ্যার বিপরীত স্বয়ং ঈসা আলায়হেচ্ছালামই যদি আকাশ হইতে অবতরণ করেন, তিনি সত্য নবী থাকিতে পারেন কিরূপে? আকাশ হইতে অবতরণ যদি খোদার রীতি বিরুদ্ধ না হয়, ইলিয়াস নবী অবতরণ করেন নাই কেন? ইয়াহিয়া নবীকেইবা ইলিয়াস সাব্যস্ত করা হইয়াছে কিরূপে? এই ঘটনা বুদ্ধিমান লোকদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

আপনাদের বিশ্বাস এই যে, আকাশ হইতে অবতরণের পর হজরত ঈসা লোকদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিবেন ; এই উদ্দেশ্যে মাহদীর সহিত একযোগে কাফেরদের সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিবেন। আপনাদের এই বিশ্বাসের ফলে ইসলামের দুর্নাম হইতেছে। ধর্ম্মের জন্য বলপ্রয়োগ করাকে কোরআনের কোথায় সঙ্গত বলা হইয়াছে? কোরআন বলে,—"লা ইকরাহ ফীদ্দীনে—ধর্ম্মে বলপ্রয়োগ নাই"। মরিয়মপুত্র মসীহকে বলপ্রয়োগের অধিকার দেওয়া যাইবে কিরূপে? তিনি 'জিজিয়া' গ্রহণ করিবেন না ; 'ইসলাম গ্রহণ কর, অথবা নিহত হও,' ইহাই হইবে তাঁহার মন্ত্র। কোরআন শরীফের কোন পারায়, কোন সুরায় এই বিধান আছে* ?

কোরআন বার বার এই কথাই বলে যে ধর্ম্ম বলপ্রয়োগ নাই। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আঁ হজরত ছঃ আঃ অছাল্লাম কোন যুদ্ধই করেন নাই, কোরআন হইতে এ কথাও সুস্পষ্ট। তিনি যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার পশ্চাতে তিনটি কারণের মধ্যে কোন না কোনটি ছিল।

(১) প্রথমতঃ, যাহারা অসংখ্য মুসলমানকে নিহত করিয়াছিল, অথবা গৃহত্যাগী হইতে হইতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ বলিয়াছেন—"উজেনা লিল্লাজীনা ইউকাতেলুনা বিআন্নাহুম জুলেমু ; অ ইন্নাল্লাহা আলা নসরিহিম লাকদীর—কাফেরগণ যে সকল মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে যুদ্ধ করিবার অনুমতি দেওয়া গেল। কারণ, তাহারা অত্যাচারিত হইয়াছে। আর জানিয়া রাখ, তাহাদিগকে বিজয়ী করিতে খোদা নিশ্চয়ই সক্ষম।" (২২ : ৩৯)

(২) দ্বিতীয়তঃ, ইসলামের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে যাহারা মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিত, তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে।

(৩) তৃতীয়তঃ, ইসলাম প্রচারে বাধা সৃষ্টি করিয়া যাহারা ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিত, তাহাদের বিরুদ্ধে।

আঁ হজরত ছঃ আঃ অছাল্লামের খলিফাগণও এই তিন কারণে ব্যতীত আর কোন কারণেই যুদ্ধ করেন নাই। অপর জাতিগণের অত্যাচারে মুসলমানগণ সহনশীলতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত খুজিয়া পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে কেমন লোক হইবেন সেই ঈসা ও মাহদী সাহেবান? আকাশ হইতে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই ঈসা সাহেব লোকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিবেন ; 'আহলে-কেতাব'দের নিকট হইতেও 'জিজিয়া' গ্রহণ করিবেন না ; 'জিজিয়া' সংক্রান্ত কোরআনের আয়াত—"হাত্তা ইয়ুতুজ্জি-জিয়াতা আইয়াদিন অ হুম ছাগেরূন" (৯ : ২৯)—তিনি রহিত করিবেন। ইসলামের কেমন সাহায্যকারী ইনি? এত বড় ওলট-পালট সত্ত্বেও 'খতম-নবুয়তের' ব্যাঘাত ঘটিবে না ত?

যুক্তির সাহায্যে মানুষের অন্তর জয় করাই প্রকৃত মসীহের কাজ। যুক্তির পরিবর্ত্তে ইসলামের জন্য যদি তোমরা বলপ্রয়োগ কর, তবে স্পষ্ট এই কথাই প্রমাণিত হইবে যে ইসলামের সপক্ষে তোমাদের কোন যুক্তি নাই*।

---

*আরববাসীদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছিল, কোরআন শরীফ এ কথাও সমর্থন করে না। আরববাসী আঁ হজরত ছঃ আঃ অছাল্লামের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছিল ; তাঁহার সহচর বহু নরনারীকে তাহারা হত্যা করিয়াছিল ; যাহাদিগকে নিহত করে নাই, তাঁহাদিগকেও দেশত্যাগী হইতে বাধ্য করিয়াছিল। নরহত্যা বা নরহত্যার সহায়তা করার অপরাধে আরব জাতি অপরাধী হইয়াছিল। "যেমন অপরাধ, তেমন শাস্তি," এই বিধান অনুসারে মৃত্যুই ছিল তাহাদের জন্য উপযুক্ত দণ্ড। তাহাদের মধ্যে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল, কৃপাময় খোদা কৃপা করিয়া তাহাদের যাবতীয় পূর্ব্ব-অপরাধ ক্ষমা করিলেন। ইহা কি বলপ্রয়োগ অথবা কৃপা প্রদর্শন?

*অজ্ঞ লোকেরা আমার বিরুদ্ধে আপত্তি করে, ইংরেজদের রাজ্যে বাস করি বলিয়াই আমি 'জেহাদ' (ধর্ম্মযুদ্ধ) নিষেধ করি। 'আল-মিনার' পত্রিকায়ও এই আপত্তি করা হইয়াছে। ইহারা চিন্তা করিয়া দেখে না যে ইংরেজদের মিথ্যা তোষামোদ করাই যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে আমি বারবার এ কথা বলিতাম না যে মরিয়ম পুত্র ঈসা ক্রুশে মরেন নাই ; ক্রুশ হইতে বাঁচিয়া যাওয়ার পর তিনি কাশ্মীরে আসেন ; কাশ্মীরে আসার পর শ্রীনগর সহরে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে ; তিনি খোদা বা খোদার পুত্র ছিলেন না। খৃষ্টধর্ম্মে আস্থাবান ইংরেজগণ আমার এই সমুদায় উক্তির কারণে আমার প্রতি বিরূপ হয় না কি? হে অজ্ঞগণ, তোমরা শুনিয়া রাখ যে আমি ইংরেজ সরকারের তোষামোদ করি না। সত্য কথা এই যে ইসলামের ধর্ম্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে তাহারা আদৌ হস্তক্ষেপ করে না ; খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারের জন্যও তাহারা বলপ্রয়োগ করে না। কোরআনের শিক্ষা অনুসারে এইরূপ সরকারের সহিত 'জেহাদ' (ধর্ম্মযুদ্ধ) করা 'হারাম' (নিসিদ্ধ)।

ইংরেজ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার আমাদের আর একটি কারণও আছে। তাহাদের রাজত্বে বাস করিয়া যে কাজ করা সম্ভব হইতেছে, মক্কা মদীনায় বাস করিলে আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইত না। জ্ঞানময় খোদা ইংরেজের অধীন দেশকে আমার জন্মভূমি করিয়াছেন। তাঁহার অসীম জ্ঞানকে আমি ক্ষুদ্র মনে করিতে পারি কিরূপে?

কোরআন শরীফের আয়াত—"অ আওয়নাহুমা ইলা রবওয়াতিন জাতে কারারিন অ মা'ঈন" (২৩ : ৫০) হইতে খোদা আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে ক্রুশের বিপদ হইতে উদ্ধার করার পর ঈসা ও তাঁহার মাতাকে তিনি "এক আরামপ্রদ ও জলপ্রস্রবন সমন্বিত উচ্চ ভূমিতে আশ্রয়" দিয়াছিলেন অর্থাৎ তাহাদের উভয়কে কাশ্মীরের শ্রীনগর সহরে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদ্রূপ আমাকেও তিনি ইংরেজ রাজত্বরূপ নিরাপত্তা ও জ্ঞান-প্রসবণ-সমন্বিত উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিয়াছেন। ইংরেজ রাজত্বে শান্তি আছে, দুষ্ট লোকদের হাত হইতে নিরাপত্তা আছে, এবং জ্ঞানের প্রস্রবণ বহিতেছে। এই গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা আমাদের কর্ত্তব্য নহে কি?

ঐতিহাসিক প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে ক্রুশবাদের ভিত্তিহীনতা সপ্রমাণ করা প্রকৃত মসীহের আর একটি কাজ; সোনা, রূপা, পিতল বা কাঠের ক্রুশ ধ্বংস করা তাঁহার কাজ হইতে পারে না।

যুক্তি প্রমাণ দিতে অক্ষম ও উদ্ধত লোকেরাই তরবারি অথবা বন্দুকের দিকে হস্ত প্রসারিত করে। যে ধর্ম্ম তরবারির সাহায্যে ব্যতীত প্রসার লাভ করিতে পারে না, নিশ্চয়ই তাহা খোদার প্রেরিত ধর্ম্ম নহে। যদি তোমরা এই শ্রেণীর জেহাদ পরিত্যাগ করিতে না পার, এই উপদেশ দেওয়ার কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া যদি তোমরা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে 'দজ্জাল' (ঘোর প্রতারক) ও 'মুলহিদ' (নাস্তিক) আখ্যা দাও, তবে এই দুইটি আয়াত পাঠ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি—"কুল ইয়া আইওহাল-কাফেরূণা, লা আয়াবুদু মা তায়াবুদুন—বল, হে অস্বীকারকারিগণ, তোমরা যাহার উপাসনা কর, আমি তাহার উপাসনা করি না" (১০৯ : ১-২)।

রসুলে করীমের সময় হইতে তের শত বৎসর অতীত হইয়াছে। মুসলমান তেয়াত্তরটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তোমাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিভেদ ও অন্তর্বিবাদ রহিয়াছে। তোমাদের কল্পিত মসীহ ও কল্পিত মাহদী কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তরবারি চালাইবেন? সুন্নিগণ শিয়াদিগকে এবং শিয়াগণ সুন্নিদিগকে তরবারির আঘাতে ধ্বংস করিতে প্রস্তুত। নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে তোমাদের এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়গুলিকে শাস্তির পাত্র বিবেচনা করে। তোমাদের কে কাহার সহিত 'জেহাদ' করিবে?

স্মরণ রাখিও, খোদা তরবারি চালনার আবশ্যকতা রাখেন না। স্বীয় ধর্ম্মকে তিনি প্রসারিত করিবেন স্বর্গীয় চিহ্ন দেখাইয়া। তাঁহার চিহ্ন প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করিবার সাধ্য কাহারও নাই। আরও স্মরণ রাখিবে, ঈসা আর কখনও এই পৃথিবীতে আসিবেন না। কোরআন শরীফের আয়াত—"ফালাম্মা তওয়াফ্ফায়তানী" (৫ : ১১৭) তাঁহার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। এই আয়াত হইতে দেখা যায়, কেয়ামতের দিন তিনি বলিবেন যে খৃষ্টানদের পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয় তিনি অবগত নহেন। কেয়ামতের পূর্ব্বে আবার এই পৃথিবীতে আসিলে তিনি এই কথা বলিতে পারেন কিরূপে? তিনি যদি আবার আসেন এবং চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আবার এই পৃথিবীতে বাস করেন, তাহা হইলে এই উক্তির পরিবর্ত্তে তাঁহার পক্ষে এই কথাই বলা উচিত যে পৃথিবীতে আমার দ্বিতীয় অবস্থানকালে আমি প্রায় চল্লিশ কোটি খৃষ্টান দেখিয়াছিলাম; আমি উত্তমরূপেই জানি যে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছিল; আমি ক্রুশ ধ্বংস করিয়াছিলাম; এবং তাহাদের সকলকে মুসলমান করিয়াছিলাম; আমি পুরস্কার পাইবার যোগ্য।

ফল কথা, এই আয়াতে হজরত ঈসার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় যে তিনি আর কখনও এই পৃথিবীতে আসিবেন না। তিনি যে আর কখনও এই পৃথিবীতে আসিবেন না এই কথাই সত্য। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; শ্রীনগরের খান ইয়ার মহল্লায় তাহার কবর রহিয়াছে*। হাঁ, খোদা স্বয়ং আসিবেন এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সহিত যুদ্ধ করিবেন। তিনি যুদ্ধ করেন চিহ্ন দেখাইয়া। ইহা আপত্তিকর নহে। মানুষ যুদ্ধ করে বলপ্রয়োগ করিয়া। ইহা আপত্তিকর।

দুঃখ হয় মৌলবীদের জন্য। তাহাদের মধ্যে যদি সততা থাকিত, ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিদের পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা তাহাদের যাবতীয় সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে পারিত। যাহাদের অন্তর পবিত্র ছিল, খোদা তাহাদের সন্দেহ দূরীভূত করিয়াছেন। আর যাহাদের প্রকৃতি আবুজাহেল সদৃশ, তাহারা আবুজাহেলের পথ অবলম্বন করিয়াছে।

এক মৌলবী সাহেব রেজিষ্ট্রী চিঠির দ্বারা মীরাট হইতে আমাকে জানাইয়াছেন যে অমৃতসরে 'নদওয়াতুল-ওলামার' সভা হইবে; ঐ সভায় উপস্থিত হইয়া আমার 'বহস' (ধর্ম্মীয় তর্কবিবক) করা উচিত। আমার বিরোধীদের উদ্দেশ্য যদি শুভ হইত, তাহাদের অন্তরে যদি হার জিতের প্রশ্ন না থাকিত, সন্দেহ নিরসনের জন্য 'নদওয়া' ইত্যাদির আবশ্যকতা কি ছিল? 'নদওয়ার' আলেমদিগকে অমৃতসরের আলেমগণ হইতে স্বতন্ত্র মনে করি না। ধর্ম্মবিশ্বাসে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় এবং প্রকৃতিতে উভয়ই এক। সত্য বুঝিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেই 'কাদিয়ানে' আসিতে পারেন, তবে 'বহস' করিবার জন্য নহে। আমার বক্তব্য শ্রবণের পরেও কোন সন্দেহ থাকিয়া গেলে ভদ্রভাবে তাহা ভঞ্জন করিয়া লইতে পারেন। আগন্তুক যতদিন কাদিয়ানে থাকিবেন, ততদিন তিনি অতিথি বিবেচিত হইবেন। 'নদওয়া' ইত্যাদি নিষ্প্রয়োজন। 'নদওয়া' হইতে আমাদের কোন আশা নাই; ইহারা সকলেই সত্যের শত্রু।

সত্য জগতময় প্রসার লাভ করিতেছে। আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্ব্বে একটি লোকও আমার পক্ষে ছিল না। 'বরাহিনে আহমদীয়া' পুস্তকে লিপিবদ্ধ ঐশীবাণীতে তখন খোদা আমাকে জানাইয়াছিলেন যে আমাকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে লোকে তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে। লোকের বাধাদান সত্ত্বেও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার সম্প্রদায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা একটি মোজেজা নহে কি? বিটিশ ভারতে আমার সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা এখন এক লক্ষের কিছু বেশী। 'নদওয়াতুল ওলামার' যদি মৃত্যু স্মরণ থাকে, তবে 'বরাহিনে আহমদীয়া' এবং সরকারী কাগজপত্র দেখিয়া বলিয়া দিক ইহা একটি বিরাট 'মোজেজা' কিনা। কোরআন আমার পক্ষে রহিয়াছে; মোজেজা আমার পক্ষে রহিয়াছে; ধর্ম্মীয় বিতর্কের প্রয়োজন কি?

পীর সাহেবান সম্বন্ধে

পীরজাদা এবং পীরের গদীতে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ দিন রাত ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত আছেন। তাঁহারা ইসলামের সহিত সম্পর্ক রাখেন না। ইসলামের সমস্যা ও বিপদের প্রতি আদৌ তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। কোরআন ও হাদীসের পরিবর্ত্তে তাহাদের মজলিসে দেখা যায় তাম্বুরা, সারেঙ্গী, ঢোলক আর কাওয়াল। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের গর্ব্ব এই যে তাহারা মুসলমানদের নেতা এবং রসুলের অনুসারী। তাহাদের কেহ কেহ স্ত্রীলোকের পোষাক পরেন; হাতে চুড়ি পরেন এবং মেহেদীর রং লাগান; নিজেদের মজলিসে কোরআন পাঠ হইতে কবিতা পাঠকে বেশী পছন্দ করেন। তাহাদের এই মরিচা অতি পুরাতন। কল্পনা করা যায় না যে ইহা দূরীভূত হইবে। তবে খোদা ইসলামের সহায়। ইসলামের সপক্ষে তিনি স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিবেন।

"স্ত্রীলোকদের প্রতি কতিপয় উপদেশ"

বর্ত্তমান যুগের মুসলমান নারিগণ ইসলাম-বিরোধী ধারণায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। একাধিক বিবাহ প্রথাকে তাহারা অত্যন্ত ঘৃণা করে; মনে হয় ইসলামের এই ব্যবস্থার প্রতি তাহাদের আস্থা নাই।

খোদার ধর্ম্মবিধানে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেওয়া হইয়াছে। ইসলামে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি না থাকিলে পুরুষদের একটি আবশ্যকতা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত।

স্ত্রী যখন পাগল হইয়া যায়, অথবা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়, অথবা চিররোগীণী হইয়া পড়ে, অথবা অন্য কোন কারণে স্ত্রী-দায়ীত্ব পালনে অক্ষম হইয়া পড়ে, সে তখন কৃপার পাত্রী। এইরূপ নারীর স্বামীও কৃপার পাত্র। কারণ, সারা জীবন সংযম রক্ষা করিয়া চলিতে সে অক্ষম। এইরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি না দিলে তাহার পুরুষ-সুলভ শক্তির প্রতি অবিচার করা হয়।

খোদার ধর্ম্মবিধানে পুরুষদের জন্য দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের পথ উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। স্ত্রীলোকদের অসুবিধা দূরীভূত করিবার পথও উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। স্বামী স্বামীত্বের দায়ীত্ব পালনে অক্ষম হইয়া পড়িলে আদালতের মধ্যস্থে স্ত্রী 'খোলা' (বিবাহ বন্ধন ছিন্ন) করিতে পারে। ইহা 'তালাকের' (পুরুষের পক্ষ হইতে বিবাহ বন্ধন ছেদনের) স্থলবর্ত্তী।

খোদার বিধানকে ঔষধালয়ের সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে। যাবতীয় রোগের ঔষধ না থাকিলে ঔষধালয় চলিতে পারে না। ভাবিয়া দেখ, কোন কোন অবস্থায় পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রীগ্রহণ করিতে বাধ্য কি না।

নরনারী উভয়েরই যাবতীয় অসুবিধা দূরীভূত করিবার ব্যবস্থা যে ধর্ম্মবিধানে নাই, উহা কোন কাজের? ইঞ্জিলে ব্যভিচারকেই তালাকের একমাত্র হেতু বলা হইয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জীবনঘাতী শত্রুতা সৃষ্টি করার মত আরও শত শত হেতু রহিয়াছে। ইঞ্জিলে তাহার উল্লেখ নাই। ইঞ্জিলের এই পঙ্গুতার কারণে খৃষ্টান জাতি ইঞ্জিলকে যথেষ্ট মনে করিতে পারে নাই। আমেরিকা বিবাহ-বিচ্ছেদের নূতন আইন করিয়াছে। ভাবিয়া দেখ এই আইনের ফলে ইঞ্জিলের মর্য্যাদা কত নিম্নে চলিয়া গিয়াছে।

*শ্রীনগরের এই কবর যে ইহুদি জাতির নবীদের কবর সদৃশ, এ কথা জনৈক ইহুদিও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার স্বীকৃতিপত্র পুস্তকের শেষে ছাপা গেল।

হে নারিগণ, তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না। খোদা তোমাদিগকে পরিপূর্ণ ধর্ম্মবিধান দিয়াছেন। উহাতে নরনারী উভয়েরই যাবতীয় সমস্যার সমাধান রহিয়াছে। ইঞ্জিলের ন্যায় তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থে মানুষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীগ্রহণে যদি তোমরা অস্বস্তি বোধ কর, আদালতের সাহায্যে তোমাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পার। এই কারণে খোদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিও না। এইরূপ বিপদের পরীক্ষা পার হইবার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে। যে স্বামী দুই স্ত্রীর মধ্যে ন্যায় ব্যবহার করে না, সে ঘোর অপরাধী। খোদার বিধানের বিরোধী হইয়া তোমরা অপরাধী হইও না। স্বামী স্ত্রী উভয়কেই নিজ নিজ কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। তোমরা খোদার হুজুরে সৎ হও; তোমাদের স্বামীদিগকে তিনি সুমতি দিবেন।

একটি নৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে খোদার ধর্ম্মবিধানে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মের এই বিধান পালনে যদি তোমরা অক্ষম হও, প্রাকৃতিক বিধান তোমাদের জন্য অবারিত রহিয়াছে। প্রার্থনা কর যেন প্রাকৃতিক বিধান হইতে সুখী হইতে পার। প্রাকৃতিক বিধান ধর্ম্মের বিধান হইতেও প্রবলতর।

খোদাকে ভয় করিয়া পুণ্যশীল হও। সংসার ও সংসারের সাজ-সরঞ্জামের প্রতি আসক্ত হইও না। বংশের গৌরব করিও না। অপর নারীকে বিদ্রূপ বা তাচ্ছিল্য করিও না। স্বামীর নিকটে তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছুই চাহিও না। চেষ্টা কর যেন নিষ্পাপ ও পবিত্র অবস্থায় কবরে পৌঁছিতে পার। নামায, জাকাত প্রভৃতি খোদার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে শিথিল হইও না। অন্তরের সহিত স্বামীর অনুগত থাকিবে। তাহাদের সম্ভ্রম অনেকটা তোমাদেরই হাতে। তোমাদের দায়ীত্ব সুচারুভাবে পালন কর। খোদার হুজুরে সদাচারিণী ও অনুগতা বলিয়া পরিগণিত হইতে চেষ্টা কর। অপব্যয় করিও না। স্বামীর অর্থ অযথা ব্যয় করিও না। বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। পরনিন্দা করিও না। অপর নারীর অপবাদ করিও না।

"উপসংহার"

জগৎময় খোদার ক্রোধের আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই আগুণ আমার সম্প্রদায়কে স্পর্শ না করুক; বর্ত্তমান প্লেগ হইতে তাহারা নিরাপদ হউক; অন্তরে খোদার ভয় বৃদ্ধি করিয়া তাহারা নিরাপত্তা লাভের উপযুক্ত হউক; এই উদ্দেশ্যে আমি এই সমুদয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করিলাম।

অকৃত্রিম 'তাকওয়া' (হায় অকৃত্রিম তাকওয়ার বড়ই অভাব) খোদাকে প্রসন্ন করে। সত্যিকার তাকওয়া-পরায়ণ ব্যক্তিকে আশ্চর্য্যভাবে তিনি বিপদ হইতে রক্ষা করেন; তাকওয়া-পরায়ণ ব্যক্তির প্রতি ইহা তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন। প্রতারক বা অজ্ঞ লোকেরাও তাকওয়া-পরায়ণ হওয়ার দাবী করিয়া থাকে। যাহার মধ্যে খোদার অনুগ্রহের নিদর্শন দেখা যায়, মাত্র সেই ব্যক্তিই তাকওয়া-পরায়ণ। প্রত্যেক লোকেই বলিতে পারে, আমি খোদাকে ভালবাসি। আকাশ যাহার ভালবাসার সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, সেই ব্যক্তিই খোদাকে ভালবাসে। প্রত্যেক ব্যক্তিই দাবী করে, আমার ধর্ম্ম সত্য। তাহার ধর্ম্মই সত্য, যে ব্যক্তি ইহলোকেই আলোক-মণ্ডিত হয়। প্রত্যেকেই বলে, আমি মুক্তি পাইব; মুক্তির পূর্ব্ব-লক্ষণ যে ব্যক্তি ইহলোকেই দেখিতে পায়, তাহার দাবীই সত্য।

খোদার প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা কর। প্রত্যেক বিপদ হইতে তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। সত্যিকার 'তাকওয়া-পরায়ণ' হও। তাকওয়া-পরায়ণ ব্যক্তিগণ খোদার আশ্রিত। তিনি তাহাদিগকে প্লেগ হইতে রক্ষা করিবেন। প্লেগ সম্বন্ধে খোদার প্রতিশ্রুতি তোমরা শুনিয়াছ। ইহা খোদার ক্রোধ-ব্যঞ্জক একটা আগুণ। এই আগুণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে যত্নবান হও। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই আমার অনুসরণ করিবে, যাহার মধ্যে কোনরূপ ব্যতিক্রম ভাব নাই, শৈথিল্য বা উদাসীনতা নাই, যাহার মধ্যে পাপ-পুণ্যের সংমিশ্রণ থাকিবে না, খোদা তাহাকে রক্ষা করিবেন। যাহার পাদক্ষেপ শিথিল, যে ব্যক্তি সংসারের প্রতি আসক্ত, সর্ব্বদাই যে ব্যক্তি 'তাকওয়া-পরায়ণ নহে, সে নিজেকে বিপদের মধ্যে আপতিত করে। সর্ব্বতোভাবে খোদার অনুগত হও।

যে ব্যক্তি মনে করে যে সে আমার নিকটে দীক্ষিত হইয়াছে, আমার আরব্ধ কাজে এখন তাহার অর্থসাহায্য করার সময় আসিয়াছে। যে ব্যক্তি মাসিক এক পয়সা দিতে পারে, সে প্রতি মাসে এক পয়সা দিবে; যে ব্যক্তি এক টাকা দিতে পারে, সে প্রতি মাসে এক টাকা দিবে। অতিথিশালার ব্যয় আছে। অপর কাজের জন্যও বহু অর্থের প্রয়োজন আছে। শত শত অতিথি আসিতেছে। অর্থের অভাবে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের জন্য আরামদায়ক ঘর তৈয়ার করা সম্ভব হয় নাই। অতিথিশালায় খাটের বন্দোবস্ত নাই। মসজিদ সম্প্রসারণের আবশ্যকতা রহিয়াছে। বৈরীদের তুলনায় আমাদের পুস্তক রচনা ও প্রকাশের কাজ অত্যন্ত দুর্ব্বল। খৃষ্টানদের পঞ্চাশ হাজার পুস্তক পুস্তিকার বিরুদ্ধে মাসে নিয়মিতভাবে আমরা এক হাজারও প্রকাশ করিতে পারি না। খোদার সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বাইয়াতকারীকে এই সমুদয় কাজের জন্য যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করা আবশ্যক। দীর্ঘকাল উদাসীন থাকার পর সময় সময় বেশী অর্থ সাহায্য করা হইতে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে অল্প সাহায্য করাও ভাল। কাহার কতটা আন্তরিকতা আছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় সাহায্যের পরিমাণ হইতে।

বন্ধুগণ, এখন ধর্ম্মের কাজে সাহায্য করিবার সময়। এই সময়টাকে অতি মূল্যবান জ্ঞান করিবে। এই সময় আবার ফিরিয়া আসিবে না। জাকাত-দাতাগণ জাকাতের টাকা এখানেই পাঠাইয়া দিক। বৃথা ব্যয় পরিহার করিয়া তোমাদের টাকা এই কাজে ব্যয় কর। সর্ব্বপ্রকারে আন্তরিকতার পরিচয় দাও। খোদার অনুগ্রহ ও পবিত্র-আত্মার সাহায্য পাইবে। এই পুরস্কার আমার সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

পবিত্র আত্মার মহত্তম প্রকাশ হইয়াছিল আমাদের রসুল ছঃ আঃ অছাল্লামের নিকটে। অপর নবী বা রসুলদের নিকটে পবিত্র আত্মা প্রকাশমান হইয়াছিলেন কপোতরূপে, অথবা গাভীরূপে, অথবা মৎস্যরূপে, অথবা কূর্ম্মরূপে। আমাদের নবী ছঃ আঃ অছাল্লামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পবিত্র আত্মা কখনও মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন নাই। আমাদের নবী ছিলেন পূর্ণ মানব। পবিত্র আত্মা তাঁহার নিকটে প্রকাশমান হইয়াছিলেন পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত পরিব্যপ্ত এক বিরাট পুরুষের আকারে। পবিত্র আত্মার এই বিরাট প্রকাশের কারণে কোরআনের শিক্ষা 'শিরক' (খোদার অংশীদারবাদ) হইতে মুক্ত রহিয়াছে। পবিত্র আত্মা খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের নিকটে আসিয়াছিলেন কবুতরের আকারে। কবুতর একটি দুর্ব্বল পাখী। এই কারণে শয়তান (অপবিত্র আত্মা) খৃষ্টধর্ম্মকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইয়াছে। শয়তান খৃষ্টধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছে বিরাটকায় অজাগরের ন্যায় মহাপ্রতাপ ও শক্তির সহিত। খৃষ্টধর্ম্মের অনাচারকে কোরআন জগতের সবচেয়ে বড় অনাচার বলিয়াছে। কোরআনে বলা হইয়াছে—একজন মানুষকে খোদার পুত্র খোদা সাব্যস্ত করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম পৃথিবীতে যে মহাপাপের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহার ফলে আকাশ ও পৃথিবী ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিবাদে কোরআনের সূচনায় বলা হইয়াছে "ইয়াকা নাবুদু" এবং "অলাজ্জাল্লীন"; উপসংহারে বলা হইয়াছে—"কুল, হুয়াল্লাহু আহাদ; আল্লাহুচ্ছামাদ; লাম ইয়ালিদ, অ লাম ইউলাদ"; এবং মধ্যভাগে বলিয়াছে—"তকাদুস সামাওয়াতু ইয়াতফত্তরনা মিনহু"। কোরআন হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, 'মানুষপূজা' ও 'প্রতারণা' সৃষ্টির আদিকাল হইতে কখনও এত প্রবল আকার ধারণ করে নাই। 'মুশরিক' জাতিগণের মধ্যে একমাত্র খৃষ্টানদিগকেই কোরআনে 'মুবাহিলা' (প্রার্থনা-যুদ্ধ) করিতে আহ্বান করা হইয়াছে।

পবিত্র আত্মা অতীতে পশু পক্ষীর আকারে প্রকাশিত হইতেন কেন? ইহার অন্তরালে কি গূঢ় রহস্য ছিল? বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিজেরাই ইহা বুঝিয়া লইবেন। আমি এতটুকু বলিতে চাই যে মনুষ্যত্বের বিকাশ আমাদের রসুলের মধ্যে সমধিক ছিল বলিয়া তাঁহার নিকটে আসিবার সময় পবিত্র আত্মাকে মানুষের আকার ধারণ করিতে হইয়াছিল। এতবড় নবীর অনুসারী হইয়াও তোমরা সাহস হারাও কেন? তোমরা পবিত্রতা ও অধ্যবসায়ের চরম আদর্শ দেখাও; আকাশের ফেরেস্তাও যেন আশ্চর্য্য হইয়া তোমাদের মহিমা কীর্ত্তন করে। জীবন পাইবার জন্য মৃত্যু বরণ কর; ইন্দ্রিয়ের প্রভাব হইতে অন্তর পরিশুদ্ধ কর; খোদা তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইবেন। এক দিকে পূর্ণ বিচ্ছেদ এবং অপর দিকে পূর্ণ সংযোগ সৃষ্টি কর। তবেই খোদা তোমাদের সহায় হইবেন।

উপসংহারে প্রার্থনা করি, আমার এই উপদেশ তোমাদের জন্য কল্যাণপ্রদ হউক ; তোমাদের মধ্যে বিরাট পরিবর্ত্তন আসুক ; তোমরা নক্ষত্র সদৃশ হও ; তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে যে আলোক দিবেন, তাহা হইতে জগৎ আলোকিত হউক। আমীন, আবার আমীন।

পরিশিষ্ট

(ক)

জনৈক তৌরিকজ্ঞ ইহুদির সাক্ষ্য।

(মূল লিপি হিব্রু ভাষায় লিখিত)

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আমি মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানীর নিকটে একটি নক্সা দেখিয়াছি। সত্য সত্যই ইহা ইসরাইল জাতির কবরের নক্সা ; ইহা ইসরাইল জাতির কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কবর।

আজ ১২ই জুন ১৮৯৯ নক্সাটি দেখিয়া আমি এই সাক্ষ্য লিখিলাম।

(স্বাক্ষর) সোলেমান ইউসুফ ইসহাক, ব্যবসায়ী।

সোলেমান ইহুদি আমার সাক্ষাতে এই সাক্ষ্য লিখিয়াছেন।

(স্বাক্ষর) মুফতি মহম্মদ সাদেক ভেরাবী,
ক্লার্ক, একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল অফিস, লাহোর।

আল্লার শপথ করিয়া আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, সোলেমান-বিন-ইউসুফ এই লিপি লিখিয়াছেন। তিনি ইসরাইল জাতির একজন প্রধান ব্যক্তি।

(স্বাক্ষর) সৈয়দ আবদুল্লাহ বাগদাদী।

(খ)

একটি বিস্ময়কর সংবাদ

দক্ষিণ ইটালির সর্বাধিক বিখ্যাত সংবাদ-পত্র "কেরিয়ার ডিলসেরা"য় নিম্নোদ্ধৃত বিস্ময়কর সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

"১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই জেরুশালেমে 'কোর' নামক জনৈক বৃদ্ধ খৃষ্টান সাধু পরলোক গমণ করেন। জীবদ্দশায় সাধু পুরুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বহুকাল ধরিয়া তিনি এক গুহায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে এই গুহায় বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রায় দুই লক্ষ ফ্রাঙ্ক (এক লক্ষ পৌনে উনিশ হাজার টাকা) ও কিছু কাগজ-পত্র পাওয়া গিয়াছিল। সেখানকার শাসনকর্ত্তা সাধুর আত্মীয় স্বজনদিগকে খুজিয়া বাহির করেন এবং এই সম্পত্তি তাহাদিগকে সমর্পণ করেন। এই কাগজ-পত্র পড়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হওয়ার কারণে হিব্রুভাষায় অভিজ্ঞ কতিপয় পণ্ডিত ইহা দেখিবার সুযোগ পান। পণ্ডিতগণ আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন যে ইহা অতি প্রাচীন হিব্রুভাষায় লিখিত ছিল এবং পাঠোদ্ধারের পর ইহাতে এই উক্তি পাওয়া গেল—

"মরিয়মের পুত্র ঈসার সেবক ধীবর পিটার খোদার নামে এবং তাঁহার ইচ্ছাক্রমে লোকদিগকে এইভাবে আহ্বান করিতেছে"। এই পত্রের উপসংহারে আছে—"আমি ধীবর পিটার আমার প্রভু মরিয়মের পুত্র ঈসার মৃত্যুর তিন ঈস-ফসার পর (অর্থাৎ তিন বৎসর পর) নব্বই বৎসর বয়সে খোদার পবিত্র গৃহের নিকটবর্ত্তী 'বোলির' নামক স্থানে এই প্রেমপূর্ণ কথাগুলি লিখিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছি।"

মরিয়মের পুত্র ঈসার প্রার্থনা—

তাঁহাদের উত্তরের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন—

"হে আমার প্রভো, আমার মতে যাহা পাপ, তাহা জয় করিবার সাধ্য আমার নাই ; যে পুণ্য করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল, তাহাও আমি করিতে পারি নাই। অপর লোকেরা তাহাদের সাধনার ফল লাভ করিয়াছে ; আমি আমার সাধনার ফল লাভ করিতে পারি নাই। আমার গৌরব আমার কাজের মধ্যেই রহিয়াছে। আমা হইতে হীন অবস্থায় আর কেহই নাই। হে খোদা, তুমি মহত্তম ; তুমি আমাকে ক্ষমা কর। হে খোদা, আমি যেন শত্রুদের আপত্তিভাজন না হই ; মিত্রদের নিকটে হেয় না হই ; ধর্ম্মপরায়ণতার কারণে আমি যেন বিপদগ্রস্ত না হই ; এই পৃথিবীকে আমি যেন অতীব সুখের স্থান বা চরম লক্ষ্য মনে না করি ; এইরূপ ব্যক্তিকে আমার উপরে কর্তৃত্ব দিও না যে আমার প্রতি সদয় হইবে না। হে খোদা, তুমি অতি দয়ালু ; নিজ দয়া গুণে তুমি এইরূপ কর। যাহারা দয়ার ভিখারী, তুমি তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া থাক।"

উল্লিখিত পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে পিটারের সময় হইতে এই লিপি সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। লণ্ডনের বাইবেল সমিতিরও এই অভিমত। বিশেষ-ভাবে পরীক্ষা করার পর এই সমিতি চারি লক্ষ 'লিরা' (দুই লক্ষ সাড়ে সাইত্রিশ হাজার টাকা) মূল্যে এই লিপি ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

"কিস্তিয়ে-নূহ"

"কিস্তিয়ে-নূহ" পুস্তকের অনুবাদ 'আহমদীর' গত ডিসেম্বর সংখ্যায় 'প্লগের টীকা' শিরোনামায় আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিতে 'আমার শিক্ষা' শিরোনামায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া বর্ত্তমান সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। আল-হামদু লিল্লাহ ; অ মা তওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

আহমদীদের নিকট 'কিস্তিয়ে-নূহ' পুস্তকের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। এ কথা বোধহয় কোন আহমদীরই অজানা নাই যে আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করিয়া আমাদিগকে খোদার বিশেষ অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে হজরত মসীহে মওউদ আলায়হেচ্ছালাম ১৯০২ খৃষ্টাব্দে উর্দু ভাষায় এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। হজরত নূহের জাহাজে চড়িয়া তাঁহার অনুচরগণ যেভাবে তখনকার সর্ব্বগ্রাসী বন্যার ধ্বংস লীলা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ এই পুস্তকে লিখিত উপদেশ অনুসরণ করিয়া আহমদীয়া জামায়াত বর্ত্তমান যুগের যাবতীয় ধ্বংসকর বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে, ইহাই ছিল এই পুস্তকে হজরত মসীহে মওউদের বাণী এবং এই কারণেই এই পুস্তকের তিনি এই নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি এই পুস্তকের দ্বিতীয় নাম রাখিয়াছিলেন 'দাওয়াতুল-ঈমান' বা 'ঈমানের আহ্বান' ; এবং তৃতীয় নাম রাখিয়াছিলেন 'তকবীয়তুল-ঈমান' বা 'ঈমান-বর্দ্ধন'। এই তিনটি নামে তিনি ইহার বিষয়-বস্তুর পরিচয় দিয়াছেন।

যাহারা উর্দু জানেন না বা ভালরূপে জানেন না, তাহাদের জন্য এই পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের ভূতপূর্ব্ব আমীর মরহুম খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরীর উদ্যোগে এই পুস্তকের প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ ইং। বহুদিন পূর্ব্বেই এই অনুবাদের পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। পরিশেষে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমান স্থির করেন যে আবশ্যক সংশোধনের পর অবিলম্বে এই অনুবাদের পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হউক।

এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা কঠিন কাজ ; উর্দু হইতে বাংলা অনুবাদ করা অপেক্ষাকৃত বেশী কঠিন। বাক্যের গঠন প্রণালীতে বাংলা ও উর্দুর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত অনুবাদে এই পার্থক্যের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখা হয় নাই। এতদ্ব্যতীত ঐ অনুবাদে কোথাও কোথাও কিছু কিছু অর্থবিকৃতিও হইয়াছিল। এই কারণে উক্ত অনুবাদের পুনর্মুদ্রণের পরিবর্ত্তে সমগ্র পুস্তকের পুনরানুবাদ করা হইয়াছে। এই নূতন অনুবাদে মূল পুস্তকের ভাবধারা বাংলা ভাষায় রীতি অনুযায়ী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এই অনুবাদে মূল পুস্তকের কোন কথাই বাদ যায় নাই বা মূল পুস্তকের বহির্ভূত কোন কথাই ইহাতে স্থান পায় নাই। বলা বাহুল্য যে এই অনুবাদের কোথাও বা একটি উর্দু বাক্যের স্থলে বাংলায় একটি বিশেষণ পদ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং কোথাও বা মূল পুস্তকের একটি বিশেষণ পদের স্থলে বাংলায় একটি বাক্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

মূল পুস্তক পাঠ করিলে পাঠক পবিত্র চিন্তা ও পবিত্র আবেগের যে তরঙ্গে ভাসিতে থাকেন, এই অনুবাদের পাঠক যদি ততটা বা প্রায় ততটা তরঙ্গায়িত হন, তবেই অনুবাদ সফল হইয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান অনুবাদকের প্রয়াস। জানি না এই প্রয়াস পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘনের প্রয়াস কি না।

সত্বর এই অনুবাদ পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হইবে। উর্দু ভাষাভিজ্ঞ আহমদী ভ্রাতাদের নিকটে অনুরোধ, এই অনুবাদের কোথাও কোন ত্রুটি তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইলে সত্বর তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

আল্লার কৃপাপ্রার্থী—

২৭।১৩।৫৪ —রওশন—

নারী-পুরুষ

—মোহম্মদ মোস্তাফা আলী

সৃষ্টিবৈচিত্র :

অতি নিম্নস্তরের জীবজগতে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ দেখা যায় না ; নিজের শরীরের অংশ-বিশেষ দ্বারা তারা বংশ রক্ষা করে থাকে। ব্যাক্‌টেরিয়া, ফাঙ্গাস, এমোবিয়া ইত্যাদি এবং অনেক গাছপালার মধ্যেও অনুরূপভাবে বংশ বৃদ্ধির অগণিত উদাহরণ মিলে। যতই উপরের স্তরে আসা যায়, ততই জীব-জগতে নারী-পুরুষের বিভাগ দেখা যায় এবং বংশ বৃদ্ধির জন্য পুনঃ মিলনের প্রয়োজন হয়। এই মিলনকে যৌন মিলন বলা হয়ে থাকে। মানুষ সবচেয়ে উন্নত জীব। মানুষের মধ্যে এই যৌন সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে। এখানে নরনারীর সম্পর্ক শুধু বংশ বৃদ্ধি, ভোগবিলাস, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদিতেই নিবদ্ধ থাকে না। নরনারীর যৌনপ্রেরণা সমাজ গঠনের একটা প্রধান উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ জন্য সমাজ-ব্যবস্থায় নরনারীর অধিকারের প্রশ্নও উঠে।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অবশ্য এখানে সম্ভব নয়। যাক, বর্তমান জীববিজ্ঞানের রায় হলো —কোন নারীই সেণ্ট পারসেণ্ট নারী নহে। প্রত্যেক নারীর মধ্যেই পুরুষের শক্তিও কাজ করছে। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম মারপেচের মধ্যে না গিয়ে সাধারণ বুদ্ধিতেও বুঝতে কষ্ট হয় না যে, নারী-পুরুষের মিলনেই নারীর জন্ম হয়ে থাকে। তার দেহ গঠনে পুরুষের দান রয়েছে। কিন্তু নারীত্বের বিকাশ যতটুকু প্রাধান্য লাভ করে থাকে, পুরুষ শক্তিটা ততটুকু ঘুমন্ত হয়ে পড়ে। পুরুষের বেলায়ও তাই। এ জন্য কোন কারণে কখনও ভারসাম্য নষ্ট হয়ে নারী পুরুষে এবং পুরুষ নারীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কার্য্যের জন্য ইঁদুরের মধ্যে প্রায়ই নরকে নারী এবং নারীকে নরে রূপান্তরিত করা হয়। নরনারীর সম্বন্ধ নির্ণয়ে এ সকল কথা স্মরণ রাখলে সমস্যা সমাধানে অনেকটা সাহায্য হবে।

নরনারীর দৈহিক পার্থক্য :

নরনারীর দৈহিক গঠনে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু অনেক পুরুষের ধারণা, দৈহিক গঠনে পুরুষ নারীর চেয়ে সর্বাংশে উন্নততর। এ ধারণা ভুল। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে উচ্চস্থানের অধিকারী। যেমন সন্তানের জন্মের জন্য নরনারীর সমপ্রয়োজন হলেও, গর্ভধারণ করে পূর্ণ সন্তান ভূমিষ্ট করার ব্যাপারে নারী অধিকতর শারীরিক যোগ্যতারই পরিচয় দেয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা যেতে পারে, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তৈরী হওয়ার লেবরেটরিটি স্রষ্টা নারীকেই দান করেছেন। দুগ্ধ জীবজগতের একটি প্রধান খাদ্য এবং সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্যও বটে। শিশু দুধ ছাড়া জীবনধারণ করতে পারে না। মা'র বুকই সেই দুধের উৎস। মা'র রক্তই দুধে রূপান্তরিত হয় এবং এই রূপান্তর মা'র দেহেই ঘটে থাকে। পুরুষের রক্তের কোন রূপান্তর নেই। এ দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, নারী তার দেহ দিয়ে রক্ত দিয়ে মানবতার যে সেবা করছে, তার তুলনা নেই। কাজেই গর্ভধারণ ও দুগ্ধদানের দিক দিয়ে নারী যে পুরুষের চেয়ে যোগ্যতর, তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

প্রকৃতিগত পার্থক্য :

দৈহিক পার্থক্য ব্যতীত নরনারীর মধ্যে প্রকৃতি-গত পার্থক্য রয়েছে। সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ইহার বিকাশ দেখা যায়। ইতিহাস ও দুনিয়ার বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে 'বাইরের কাজে' (রাজনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ, জীবিকা অর্জ্জনে অনেক ক্ষেত্রে) পুরুষই প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। যদি নারী এবং পুরুষ এ সকল কাজে সম-প্রতিভার অধিকারী হতো, সর্বকালে, সর্বদেশে এরূপভাবে পুরুষের প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব হতো না। যদি কেহ তর্ক তুলেন যে, পুরুষ ইচ্ছা করেই নারীকে ছোট করে রেখেছে—তাঁর এ যুক্তি অচল। সমান হলে পুরুষ সর্বপ্রথম কি করে প্রাধান্য বিস্তার করলো? তা'ছাড়া কোন না কোন সময়, কোন না কোন দেশে নারীও পুরুষের সমান হতো বা প্রাধান্য লাভ করতো। প্রতিভার সমঅধিকারী হয়েও পুরুষ সব সময়ে প্রাধান্য বজায় রেখে চলেছে—এ কথা ভ্রান্ত। অন্ততঃ বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে নারীর স্বাধীনতা ও প্রগতির কোন বাধা নেই বলেই সবাই স্বীকার করছে, কিন্তু সেখানেও কয়জন নারী প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি প্রভৃতি পদ দখল করে আছে? ইদানিং জাপানী ডায়েটে নারী সদস্যেরা প্রাধান্য লাভ করেও তা রক্ষা করতে পারে নি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চোখের পানিতে বিজয়ের উল্লাস ধুয়ে ফেলতে হলো! কত দেশে কতো অধঃপতিত অধীন জাতি স্বাধীন হচ্ছে—আর নারী জাতি কেন চিরকাল পুরুষের অধীনে রইল? তবে ত তারা প্রকৃতিগত কারণেই অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে। পুরুষ নারীর স্বাধীনতা হরণ করে নি বরং নারী পুরুষের অধীনতা বরণ করেছে। পুরুষ দৈহিক ও প্রকৃতিগত বিশিষ্টতার দরুণই কতকগুলো কাজে প্রাধান্য লাভ করে আসছে।

অপর দিকে গর্ভধারণ এবং দুগ্ধদান কাজে নারী যেমন দৈহিক দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে যোগ্যতর, তেমনি ঐ সকল কারণেই নারী 'ঘরের কাজে' প্রকৃতিগতভাবেও অধিকতর পটু। সন্তানের লালন-পালন, ঘরকন্নার কাজ প্রভৃতিতে পুরুষ কখনও নারীর সমকক্ষতা করতে পারে না। জীবন যাত্রায় ও সমাজ গঠনে এ সকল কাজ বাইরের কাজ হতে কোন অংশে হেয় নহে। কতক্ষণের জন্য রাখতে গিয়ে বাপ যখন ছোট শিশুকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন—কোন ভাবেই কান্না থামাতে পারেন না, তখন দেখা যায়, মা'র কোলে গিয়াই শিশু আনন্দমুখর হয়ে উঠে। এ সকল লক্ষ্য করেই হয়ত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"পুরুষ দিয়েছে বীর্য্য আর নারী দিয়েছে মাধুর্য্য।" জীবিকা অর্জনের কাজে পুরুষের প্রাধান্য থাকলেও জীবনকে সুন্দর করার কাজে নারীরই প্রাধান্য। কাজ দ্বারা উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ হওয়ার পিছনে বিশেষ কোন যুক্তি নেই—তবে কোন কোন কাজে কারো কারো প্রাধান্য স্বীকার করাতেও অযথা বাধা সৃষ্টি করে লাভ নেই।

নরনারীর অধিকার ও নৈতিক মান :

নরনারীর সমন্বয় ও সহযোগিতাই সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠে। যে কোন একজনকে বাদ দিলেই সমাজে অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে। সামাজিক জীবনের ক্রমোন্নতিতে 'ভেটো' দিবার স্বাভাবিক অধিকার দু'জনারই রয়েছে। এমন কি নারী-পুরুষ সমতালে অগ্রসর না হলেও সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে সমাজব্যবস্থার সব ক্ষেত্রেই নরনারীর সমান অধিকার থাকবে বা নরনারীর জন্য নৈতিক মান একই হবে—তা গ্রহণ করা যেতে পারে না।

নরনারীর দৈহিক ও প্রকৃতিগত ব্যবধানকে লক্ষ্য রেখে এমনভাবে সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে প্রত্যেকের প্রকৃতিগত শক্তি ও গুণরাজি সুষ্ঠু বিকাশের পথ পায়। এতে উভয়ই সবক্ষেত্রে সমান, এ ভাবধারার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বরং এ ভাবধারা দ্বারা উভয়েরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক সমাজব্যবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার থাকবে, আবার কখনও নারীর প্রাধান্য হবে, কখনও বা পুরুষের প্রাধান্য হবে।

একই কারণে নারী-পুরুষের নৈতিক মানও হুবহু এক হতে পারে না। অবশ্য নৈতিক মানের বিভিন্নতা হলেও উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য এক হবে। সে উদ্দেশ্য হবে—নারী-পুরুষ উভয়েরই উচ্ছৃঙ্খলতা ও জড়তা হতে সমাজকে রক্ষা করা ; যেমন বি, এ এবং বি, এস-সি কোর্স এক না হলেও উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য হলো জ্ঞান আহরণ ও ডিগ্রি হাসেল করা।

মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব :

ইতিপূর্বে 'বহু বিবাহের অন্তরালে' নামক প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে যে, প্রকৃতি মাতৃত্বকে যেভাবে নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছে, পিতৃত্বকে সেভাবে নির্দ্দিষ্ট করেনি। গর্ভসঞ্চারের জন্য নরী-পুরুষের সমান প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু একই নারীর সাথে যদি একাধিক পুরুষের মিলন হয়, তবে সন্তানের পিতৃত্ব নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতি মাতৃত্বকে এরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে যে, তা অস্বীকার করার কোন পথ নেই।

বিবাহ বন্ধনের সৃষ্টি করে যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত না করলে পিতৃত্ব নির্দ্দিষ্ট করাই সম্ভব হতো না। সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সামাজিক জীব যত কিছু আবিষ্কার করেছে, তন্মধ্যে বিবাহই তার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই হলো পিতৃত্বকে নির্দ্দিষ্ট করে পরিবার গড়ে তোলার পথ

প্রশস্ত করে দেওয়া। সংক্ষেপে প্রাকৃতিক বিধানে মাতৃত্বের মূল্য ও প্রয়োজন বেশী—আর সামাজিক বিধানে পিতৃত্বের মূল্য অধিক। এজন্যই আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা পিতৃপ্রধান হয়ে গড়ে উঠেছে।

বিবাহ বন্ধনে পুরুষের ত্যাগ ও নারীর বিজয় সূচিত হয় :

আধুনিক বিজ্ঞানের মত হলো, পুরুষ বহুমুখী (by nature polygamous)। কথাটা স্বীকার করে নিলে দেখা যাবে যে, বিবাহের বন্ধন মেনে নিয়ে পুরুষ অনেক ত্যাগ স্বীকার করছে। তুলনামূলকভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, বিবাহ বন্ধন দ্বারা পুরুষের যৌনজীবন অধিকতর নিয়ন্ত্রণে আসে। তা'ছাড়া বিবাহ বন্ধন না থাকলে সন্তানের পিতৃত্ব নির্দিষ্ট করা সম্ভব হতোনা বলে সন্তানের লালনপালনের সাথে নারীকে তার নিজের ভরণপোষণের ভারও নিতে হতো। বিবাহ ফাঁদে ফেলে পরিবারের ভরণপোষণের ভার পুরুষের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বুদ্ধির বাজারে পুরুষকে বেশ ঘায়েল করেছে। অপরদিকে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় নারী বিবাহের পর যে ভাবে পুরুষের ঘরটি দখল করে বসে, তাতেও তার বিজয়-অভিযানই সূচিত করছে।

সন্তানের লালনপালন ও পরিবারের ভরণপোষণ :

প্রকৃতিগত কারণে মা'র সাথে সন্তানের সম্পর্ক গাঢ়তর বলে মা-ই সহজে সন্তানকে মানুষ করে গড়ে তুলতে পারে। তাই মাকে এজন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দিতে হবে। অপরদিকে পুরুষকে গর্ভধারণ করতে হয় না বলে এবং শারীরিক দিক দিয়ে সে বাইরের কাজের জন্য অধিকতর উপযুক্ত বলে পরিবারের ভরণপোষণের ভার পুরুষের কাঁধে নেওয়া শ্রেয়তর। তাতে নারী ও পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগের কাজটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

মোহরানা :

সব ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের দাবী এক হলে বিবাহের ব্যাপারে নারীকে মোহরানার দাবী ছাড়তে হবে। অথচ একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে, মোহরানার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। এবং তা করলে সমাজের লোকসান বৈ লাভ হতে পারে না। মোহরানার সপক্ষে বহু যুক্তিই দেখানো যেতে পারে। সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো যৌনমিলনের আনন্দ, ভোগবিলাস স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষের জন্য হলেও ইহার পরবর্তী ফল উভয়ের জন্য একরূপ হয় না ;—'এক যাত্রায় দু'ফল'। পুরুষ যেখানে মুক্ত, নারীর জীবনে সেখানে অনেক বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে—যার হিম্মা পুরুষ ইচ্ছা করলেও নিতে পারে না। এজন্য তাকে মোহরানা দিয়ে কিছুটা সাহায্য (compensate) করা হয়।

তালাক ও খোলা :

নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই তালাক ও খোলার মধ্যে সর্তের যে ব্যবধান রয়েছে, ইহার যাথার্থ্য ধরা পড়ে। নারী ভাবপ্রবণ ও দুর্বল। তাই তার বিচার বিবেচনার মধ্যে গলদ থাকার সম্ভাবনা অধিক। এ সম্ভাবনাকে যথাসম্ভব শুধরে নেওয়ার জন্য নারীকে স্বামী ত্যাগ করতে হলে বিচারকের মধ্যস্থতায় করতে হয় এবং এজন্যই বিবাহের সময়েও তাকে ওলির মত নেওয়ার প্রয়োজন হয়।

দায়ভাগের অধিকারে বিভিন্নতা :

অনেকে যারা নারী-পুরুষের সমঅধিকারে বিশ্বাসী, তারা ইসলামী সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পত্তির অধিকারে তারতম্য রয়েছে বলে আপত্তি তুলে থাকেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, ইসলাম এতে নারীদের প্রতি কোনই অবিচার করেনি। নারী স্বামীর নিকট হতে মোহরানা পায়। তা' ছাড়া বাপের সম্পত্তিতে দু' মেয়েতে এক পুত্র সন্তানের সমান পেয়ে থাকে। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখলেই উপরোক্ত প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। নারী যে সম্পত্তি পায়—নিজস্ব ভোগ দখলের জন্যই পায়। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় সাধারণতঃ তাকে অন্যের ভরণপোষণের ভার নিতে হয় না। তার নিজের ভরণপোষণের ভারও স্বামীর উপরেই। অপর দিকে ভাই যে বোনের দ্বিগুণ সম্পত্তি পেয়ে থাকে—তার নিজের এবং বিবাহ করে যে নারী ঘরে আনে, তার ভরণপোষণের ভারও নিতে হয়। এ জন্য তাকে দু' বোনের সমান সম্পত্তি পাওয়ার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। বোনে নিল অর্দ্ধেক, স্ত্রী বসালো ভাগ—সে হিসেবে সম্পত্তিতে নারীদেরই ভোগদখল বেশী হচ্ছে বলে কেউ মনে করতে পারে। তা' ছাড়া স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশও পেয়ে থাকে।

বর্তমানে ভারত পিতার সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার দিতে যাচ্ছে। তারাও দু' বোনকে এক ভাইয়ের সমান গণ্য করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আশ্চর্য এই যে, একটা বিরাট দেশে শত শত নির্বাচিত প্রতিনিধি কয়েক বৎসর ধরে বিচার-বিবেচনা করে যা করতে যাচ্ছে, ১৪শত বৎসর পূর্ব্বে নারী জাতি শুধু একই ব্যক্তির মাধ্যমে তার চেয়ে বেশী অধিকার পেয়েছে। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার উপরে দায়ভাগ নিয়ে প্রশ্ন না হয়ে বরং এখন যাতে খোদা প্রদত্ত অধিকার হতে নারী অযথা বঞ্চিত না হয়, সেটার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা উচিত। যারা বর্তমান দায়ভাগ হতেই নারীকে বঞ্চিত করেছে, তারা নারীদের অধিকার পুরুষের সমান করে দিলে, আরো বেশী করে রুখে দাঁড়াবে নাকি? বরং তাদের দল আরও ভারী হয়ে দাঁড়াবে। ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান নারীদের প্রতি দায়ীত্ব পালনে নিশ্চয় পশ্চাদপদ হবে না বলেই আশা করা যায় এবং তজ্জন্য শাসন সংবিধানে নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত থাকবে।

শাসন ও শাস্তির অধিকার :

ইসলামী শরীয়ত কোন কোন অবস্থায় স্বামীকে স্ত্রীর উপর শাসন ও শাস্তি দিবার বিধান রেখেছে। এখানেও অনেকে প্রশ্ন তোলে থাকে যে নারীকে সে অধিকার দেওয়া হয়নি। এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌছুতে হলে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। প্রথমতঃ শরীয়ত পুরুষকেই পরিবারের কর্তৃত্বের ভার দিয়েছে এবং ইহা হওয়াই স্বাভাবিক। অপর দিকে যার উপর যতটুকু কর্তৃত্ব দেওয়া হয় তার হাতে সে পরিমাণে ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে অন্যথা কোন স্থানেই শাসন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই উছুলের উপরেই সরকারের হাতে সৈন্য ও পুলিশ নিয়োগ এবং আইন শৃংখলা কায়েমের জন্য অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে।

এ অধিকার না থাকলেও পুরুষ সবল বলে অবলা নারীর উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতই। তখন সেটা হয়ত নারীর জন্য মারাত্মক হয়ে দাড়াত। কিন্তু শরীয়ত পুরুষের অবাধ অধিকার না দিয়ে নানা সর্ত আরোপ করে তার শক্তির উপর বরং অনেকটা ব্রেক্ কষে দিয়েছে।

অপর দিকে নারীকে অনুরূপ অধিকার দিলেও উহা কাগজে কলমেই নিবদ্ধ থাকত। কারণ অবলা or weaker sex বলে সে পুরুষের উপর ঐ কর্তৃত্ব খাটাতে পারত না। তাই যে অধিকার দ্বারা ফায়দা উঠান যায় না, যে অধিকার বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না সে অধিকারের জন্য দাবী করে কোন লাভ আছে কি? বরং দেখতে হবে শাসন ও শৃংখলার নামে স্বামী যেন স্ত্রীর উপর অযথা কোন অত্যাচার না করে।

উপসংহার :

অনুরূপভাবে নারী-পুরুষের অধিকার নিয়ে আরো বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। উপরোক্ত আলোচনা শুধু সাধারণ অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। নারীদের অনেকেই কোন কোন সময়ে পুরুষের ক্ষেত্রে এসেও বেশ দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। আবার পুরুষও সময়ে সময়ে নারীর কার্যক্ষেত্রে তার সমকক্ষতা করছে। তাই উনোর প্রেসিডেন্ট পদ যেমন নারী দ্বারা অলংকৃত হচ্ছে, তেমনি পুরুষও হোটেল-রেস্তোঁরাতে রান্নাবান্নার কাজ বেশ দক্ষতার সাথেই চালিয়ে যাচ্ছে। তাই সমাজব্যবস্থায় এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম থাকতে পারে না—যার দ্বারা কতক কাজ নরের জন্য বা কতক কাজ নারীর জন্য হারাম করে রাখা হবে।

প্রকৃতিগত যোগ্যতার খাতিরেই কর্মক্ষেত্র নির্দ্ধারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্র নির্দ্ধারিত করতে গিয়ে একথাও মনে রাখতে হবে—কোন নারীই পুরো নারী নহে—আবার কোন পুরুষই পুরো পুরুষও নহে। যার মধ্যে যে শক্তি-গুলোর যতটুকু বিকাশ হয়েছে, তাকে সে ধরনের কাজেই লাগাতে হবে—তা হলেই মানবতার দু' পা সমতালে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।

[মাসিক মোহম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৬১]

[তালাক-খোলা ও শাসন-শাস্তি নিয়ে আলাদা আলোচনার ইরাদা রহিল।]

নবী দিবসে

—মোহম্মদ মোস্তাফা আলী

সূচনা :

'দিবস পালন' বিংশ শতাব্দির একটা বৈশিষ্ট্য বলতে হবে। ইহা দ্বারা কোন উদ্দেশ্যকে জন-সাধারণের মধ্যে সহজে প্রচার করা যায়। তাতে জনমত গঠন যেমনি সহজ হয়, উদ্যোক্তারাও তেমনি অনুপ্রেরণা পায়; তাদের কর্মক্ষমতা বাড়ে এবং সংগঠনি শক্তিরও বিকাশ হয়।

পাকিস্তান ও নবী দিবস :

হযরত রছুল করীম ছাঃএর জন্ম ও মৃত্যু দু-ই রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখে হয়েছিল। এই দিনটি মোসলেম জগতে একটি বিশেষ দিন বলে গণ্য হয়ে আসছে। ঐ দিন সকল দেশের মুসলমানেরাই দোয়া দরুদ পাঠ, ওয়াজ নছিহত করে আসছে। কিন্তু নবজাত পাকিস্তানই সর্ব্বপ্রথম সরকারীভাবে ঐ তারিখটিকে 'নবী দিবস' পালনের জন্য ঘোষণা করেছে। ঘোষণার উদ্দেশ্য পাকিস্তানিদের জীবনের সাথে রছুলুল্লার জীবনের সংযোগ সাধন করা, তাঁর আদর্শের সাথে নিবিড় পরিচয় করা। এই সংযোগ ও পরিচয়কে বাস্তব জীবনে সার্থক করে তোলার জন্য রছুলের পদাঙ্ক অনুসরণই একমাত্র পথ। এ পথে চলতে পারলে একদিকে যেমন পাকিস্তানের জন্মের মূল উদ্দেশ্য সার্থক হবে, তেমনি ইসলামের ভবিষ্যতের জন্যও সুফলপ্রসূ হবে।

আদর্শের গতি :

এখানে আদর্শ সম্বন্ধে দু' একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আদর্শ এমন জিনিষ যাকে নদী, পাহাড় পর্বত, শুল্কের প্রাচীর, কূটনীতির বেড়াজাল, দূরত্বের ব্যবধান কোন কিছুতেই আটকিয়ে রাখা যায় না। তবে আদর্শের নিজস্ব কোন গতি আছে বলে মনে হয় না। মানব চরিত্রের মাধ্যমেই ইহার গতি হয়। তাই সমষ্টি জীবনে যদি আমরা রছুলুল্লার আদর্শের রূপায়ণ ঘটাতে পারি, জগত যদি দেখতে পায় এর দ্বারা মানবতার পূরিপূর্ণ বিকাশ হচ্ছে, তবে দুনয়া নিশ্চয় এদিকে এগিয়ে আসবে। পতঙ্গ আলোক-রশ্মিতে আকৃষ্ট হয়ে জীবন দেয়; মানব হৃদয় আদর্শের সংস্পর্শে সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়। তাই নবী দিবসের সার্থকতা সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা, কবিতা বা প্রবন্ধের দ্বারা ততটা সার্থক হবে না যতটা হবে আমাদের জীবনকে তাঁর আদর্শের সৌন্দর্য্যে গড়ে তোলার দ্বারা।

কোরআন ও নবী দিবস :

এবারের নবী দিবসে মনের কোণে কয়েকটি দ্বন্দ এসে জমা হয়! তা' নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যা'ক।

শত শত বই পুস্তকে পড়েছি, হাজারো বক্তৃতায় শুনেছি, নিজেও দু' চার বার লিখেছি—'কোরআনই দুনয়ার সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে।'

প্রশ্ন জেগেছে, যদি তাই হয় তবে নবী দিবস পালনের জন্য এত তাড়াহুড়া কেন? কোরআন ত রছুলের সময় হতে আজ পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই আছে। কোরআন খুল্লেই যদি সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়, তবে রছুলুল্লা যিনি চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মরজগত হতে বিদায় নিয়েছেন—শত কান্নাকাটি করেও যাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না—তাঁর জন্ম মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে দিবস পালনের সার্থকতা কোথায়? তা' ছাড়া এ প্রশ্ন জাগাও স্বাভাবিক—যদি রছুলুল্লাকে ডেকে এনেই আমাদের সমস্যার সমাধান করতে হয়, তবে কোরআনের নামে যে আমাদের উপরোক্ত দাবী—তা অনেকটা ভূয়া হয়ে দাঁড়ায় নাকি?

বস্তুতঃ নবী দিবসের ভিতর দিয়ে আমরা যদি আবদুল্লাহ ও আমেনার সন্তান মোহম্মদকে খুঁজে বেড়াই, তবে এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু তা না ক'রে যদি আমরা কর্মী মোহম্মদ, সাধক মোহম্মদ, রছুল মোহম্মদ ছাঃএর সন্ধান নেই, তবেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে।

কথাটা আরো বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে কিতাবই মানব চরিত্রের পরিবর্তন সাধনে যথেষ্ট নয়। এ কথা অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় কোরআনের বেলায়ও প্রযোজ্য। কিতাবের পেছনে ব্যক্তিত্বের সংযোগ থাকা চাই। যে শিক্ষা যত বড়, তার পেছনে তত বড় একটা ব্যক্তিত্ব কাজ না করলে সেটা সমাজ জীবনে সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

এখানে আর একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। কিতাব হয়ত নবী রসুলের শিক্ষাকে এক যুগ হতে অন্য যুগে বহন করে নিয়ে আসতে পারে কিন্তু মৃত্যুর দ্বার ডিঙ্গিয়ে নবী রছুলকে এনে হাজির করতে পারে না। তাঁদের আদর্শের একটা ছবি আসে বটে কিন্তু তাঁদের জীবন্ত ব্যক্তিত্ব হতে আমরা বঞ্চিত হই। এই জীবন্ত ব্যক্তিত্ব শূন্য আদর্শ সমাজে পূর্ণ মাত্রায় কার্য্যকরী হয় না। তাই আজ হিন্দুর ঘরে ঘরে গীতা পাওয়া গেলেও কোন হিন্দুর ঘরেই গীতার হিন্দুর সন্ধান পাওয়া যায় না। তা' পেতে হ'লে আমাদিগকে আবার শ্রীকৃষ্ণের যুগে যেতে হয়। এ কথা ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান সকলের বেলাই খাঁটে।

এক কথায়, কিতাব হতে আমরা পাই 'আইডিয়েল'; আর নবী রসুল হতে পাই 'মডেল'। আইডিয়েল ও মডেলের সংযোগের ফলেই নবী রসুলের আগমণে মানব সমাজের বিরাট বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

কোরআন করীমে আইডিয়েলের পূর্ণতা লাভ হওয়া সত্বেও রছুলুল্লার তিরোধানের পর যতই দিন গত হচ্ছে মুসলমানদের নিকট হতে মডেল ততই দূরে সরে যাচ্ছে। তাই কোরআনের শিক্ষা তাদের জীবনে বিশেষ কার্য্যকরী হচ্ছে না।

কিতাবের কামালিয়তের দাবী শুধু মুসলমানদেরই নয়—বলতে গেলে সকল ধর্ম্মই এ দাবী ক'রে আসছে। কিন্তু যে ধর্ম্ম এই দাবীর সাথে মডেলও পেশ করতে পারবে, সে ধর্ম্মই সফলতা লাভ করতে পারবে। নতুবা শুধু দাবীতেই দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয় না।

নবী দিবস ও আহমদীয়া জামায়াত :

আহমদীয়া জামায়াতের মাধ্যমেই মডেলের প্রশ্নের সমাধান মিলতে পারে। আহমদীয়া জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্য্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কোরআন করীম হতে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন যে একমাত্র ইসলামের মধ্যেই নবুওত-প্রাপ্তির দরজা খোলা রয়েছে। এখন নবীর আগমণ হবে মোহাম্মদী শরীয়তে পুনর্জীবন সঞ্চারের জন্য। সে নবী হবেন কোরআন ও রছুলুল্লার পূর্ণ পা-বন্দ। এরূপ নবীর আগমণে কোরআনের আইডিয়েলের সাথে মডেলের সংযোগ ঘটবে এবং তাতেই ইসলামের নবজীবন লাভ হবে। এযুগে হযরত মীর্য্যা গোলাম আহমদ (আঃ) অনুরূপ নবী হয়েই আগমণ করেছেন। তাঁর দ্বারাই ইসলামের পুনরুদ্ধার পর্ব আরম্ভ হয়েছে।

এদিক দিয়ে বিচার করলে নবী দিবসের গুরুত্ব আহমদীয়া জামাতের জন্য অত্যধিক। তারা যে মহান সত্যের সন্ধান পেয়েছে—তারা যে ভাবে হযরত নবী করীম ছাঃকে বুঝতে পেরেছে—তা তাদের প্রচার ও আমল দ্বারা দুনয়ার সামনে তুলে ধরতে হবে। তাদের কর্তব্যে অবহেলা করলে তা'দিগকে নিশ্চয়ই আল্লার দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

রছুলকে ফিরে পাওয়ার পথ :

রছুলকে ফিরে পাওয়ার জন্য মানব হৃদয়ে আজ এক বিরাট ব্যাকুলতা জেগে উঠেছে। তাই কবি-হৃদয়ে ধ্বনিত হচ্ছে :

"হে রসুল আজি ফিরে এস হেথা
ফিরে এস আজি তুমি,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমাকে খুঁজিছে
ব্যাকুল এই বিশ্বভূমি।"

[মীর্জা আবু নইম শামসুল হুদা]

"মানবের মাঝে হে মহামানব
আবার তোমারে চায়।
কাঁদে মানবতা অসহায় আজি
ফেরেবের দুনিয়ায় ॥

[মতিউর রহমান চৌধুরী]

সাধারণ মানুষই হউক, আর নবী রসুলই হউক, মৃত্যুর পর কেউ আর ফিরে আসে না। কিন্তু 'ফেরেবের দুনিয়ায়', ইবলিসের রাজত্বে নবী না হ'লে আর চলে না। কামেল কিতাব দিয়ে ত মানবতাকে আর বাঁচানো যাচ্ছে না—এখন যে কামেল মানুষেরও একান্ত দরকার।

রছুলুল্লার আদর্শ ও অনুপ্রেরণাকে চিরঞ্জীব করার জন্য আল্লাহতায়ালা একমাত্র মোহম্মদী শরীয়তের অধীনেই নবুওতের দরজা খোলা রেখে সে পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন; এবং ইহাই ইসলামের পূর্ণতার মাপকাঠি।

নবীর আগমণ ও মানব প্রকৃতি :

নবী দিবসে আর একটা কথাও বেশ করে মনের কোণে দানা বেধেছিল। নবী রসুলের

আগমণে বিশ্বে প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন আসে বলে মনে হয় না। তাঁহাদের দ্বারা কাঁঠাল গাছে আম ধরেনি, মাকাল ফলও সুস্বাদু হয়ে উঠেনি। রসুলুল্লার আগমণেও মরু-আরব শস্য শ্যামল হয়ে উঠেনি, আরবের বালুকারাশি সোনা রূপায় রূপান্তরিত হয়নি, আরবের বুক চিরে খনিও বের হয়নি।

তাঁদের আগমণে মানব প্রকৃতিরও মূলগত কোন পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন সাধিত হয়নি। রসুলকে যারা গ্রহণ করে তাদের দৈহিক কোন পরিবর্তন হয় বলেত কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। নবীগণ মানুষের শক্তি সামর্থ্যের কোন পরিবর্তন সাধন করেন না। তাঁরা শুধু মানব জীবনের লক্ষ্যের পরিবর্তন সাধন করেন; দৃষ্টিভংগী পরিশুদ্ধ করেন; ফলে তাদের কর্ম্মধারায়ও পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তন দ্বারা একটা নূতন পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি হয়; সমাজে নতুন নৈতিক মান সৃষ্টি হয়। আমাদের যুগেও মানব প্রকৃতির মূলগত কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। তাই প্রথমিক যুগের মুসলমানেরা যা করতে পেরেছেন—আমাদেরও অনুরূপ কিছু করতে না পারার কারণ নেই। তার দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন ও পরিশুদ্ধি না হলে তা সম্ভব নয়।

নবীর কাজ:

এখানে আর একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেকেরই কর্মের ক্ষেত্র আছে। যে ব্যক্তি যে ক্ষেত্রের কর্মী সে ক্ষেত্রেই সে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারে। কবিকে বিজ্ঞানের সাধনায় লাগালে যেমনি ফেল করে—তেমনি বৈজ্ঞানিককে রাজনীতিতে টেনে আনলে বা কবিতা লিখতে দিলেও ব্যর্থ হবে। নবীর কাজও অন্যের দ্বারা সম্ভব হতে পারে না। দুনয়ার ইছলাহ করা, স্রষ্টার সাথে মানুষের সংযোগ সাধনের অভিজ্ঞতা দান করা—নবী ছাড়া অন্যের দ্বারা পূরিপূর্ণভাবে সম্ভব হতে পারে না।

উপসংহার:

বর্তমান দুনয়ারও নিশ্চয়ই ইছলাহের প্রয়োজন আছে। এই ইছলাহ কোন নবীর আগমণ ছাড়া সম্ভব হতে পারে না। রছুলুল্লার মারফত জমানার নবীর সন্ধান পেলেই নবী দিবস সার্থক ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। জগতকে এই সন্ধান দেওয়া আহমদীগণের প্রধান কর্তব্য।

আখবার-আহমদীয়া

কর্জ্জ হাসানায় পাঁচ সালা শিক্ষা স্কিম

১৯৫৪ সালে মজলিসে ছুরায় হজরত খলিফাতুল মসিহ ছানি ঘোষণা করিয়াছেন যে, গরীব আহমদীদিগকে সর্ব্ববিষয় উন্নত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আজ ২০।২৫ বৎসর হইতে চলিল গ্রামদেশে জমাত স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সব জমাতে অদ্যাবধি কোন গ্রাজুয়েট ছেলে দেখা যায় না। যদি গ্রামের ১০'১৫ জন কৃষক সম্মিলিত ভাবে ২'১ জন গরীব ছেলের উচ্চ শিক্ষার ভার নিত, তাহা হইলে এতদিনে বহু উচ্চ শিক্ষিত গ্রাজুয়েট যুবক পাওয়া যাইত। গরীবদের শিক্ষার স্কিমটি নিম্নরূপ:

জামাতের প্রত্যেক নর নারী এই কর্জ্জ হাছানা স্কীমের মেম্বার হইতে পারিবে। প্রত্যেকে অন্ততঃ পক্ষে মাসিক ১৲ করিয়া অথবা ষান্মাসিক ৬৲ টাকা হারে সদর আঞ্জুমানে চাঁদা দিতে হইবে। বৎসরান্তে প্রত্যেক নূতন বৎসরে ইচ্ছানুযায়ী এই চাঁদা বাড়ান বা কমান যাইবে। বৎসরান্তে কার কত চাঁদা হইয়াছে, সদর আঞ্জুমান তাহার হিসাব দিবে। প্রতি বৎসরের জমা কৃত টাকার পাঁচ ভাগের চার ভাগ ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে। বাকী পাঁচ ভাগের এক অংশ কোন ব্যবসায় খাটাইয়া বর্দ্ধিত করিবার অধিকার সদর আঞ্জুমানের থাকিবে। কোন সভ্যরই প্রথম পাঁচ বৎসরে কোন টাকা ফেরৎ পাওয়ার অধিকার থাকিবে না। ৬ষ্ঠ বৎসরে জমা টাকার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ফেরৎ দেওয়া হইবে। ৭ম বৎসরে পাঁচ ভাগের দুই ভাগ এবং এইরূপে ১০ বৎসরে চাঁদা দাতাদের সব টাকা ফেরৎ দেওয়ার পর যে টাকা বাকী থাকিবে উহা নিম্নরূপ ভাবে ৫ রকমের বৃত্তি দেওয়া হইবে। যথা— (১) কৃষকদের মধ্যে (২) ছোট ছোট শিল্পীদের (৩) চাকুরিয়াদের, উপরোক্ত বৃত্তি জেলাওয়ারি হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক জেলার আদায়ীকৃত টাকা ঐ জেলার ছাত্রদের মধ্যেই দেওয়া হইবে। (৪) মেয়েদের জন্য (৫) স্বকীয় নামের বৃত্তি। ৪র্থ ও ৫ম প্রকার বৃত্তি প্রাদেশিক ভিত্তিতে দেওয়া হইবে। অর্থাৎ যে প্রদেশ হইতে যত টাকা আদায় হইবে ঐ প্রদেশের মধ্যেই উহা বণ্টন করা হইবে। মেয়েদের দেওয়া টাকা মেয়েদের মধ্যে বৃত্তি দেওয়া হইবে। স্বকীয় নামের টাকা যিনি মাসিক চাঁদা ৫০৲ টাকা হিসাবে ৫ বৎসর জমা করিয়াছেন, তাঁহার নামে সদর আঞ্জুমান ম্যাট্রিকের পর উচ্চ শিক্ষার্থে বৃত্তি জারি করিবেন। বৃত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্জ্জ হাছানা (পরিশোধীয় ধার) হিসাবে নেজারত তালিম-তরবিয়ত হইতে বৃত্তি গ্রহণ করিবে, এবং চাঁদাদাতাও নেজারত হইতে ঐ টাকা ফেরৎ পাইবে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের নিয়মানুযায়ী এই টাকা জমা হইতে থাকিবে।

ইহা বাস্তবিকই একটি উত্তম ব্যবস্থা। ইহার মধ্যে জেলায় জেলায়, প্রদেশে প্রদেশে ও মেয়ে পুরুষে ছওয়াবের কাজে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রত্যেক সক্ষম আহমদি ভ্রাতা এই স্কীমে বেশী বেশী অংশ গ্রহণ করিলে খোদার ফজলে আগামী ১০-১৫ বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ আহমদীগণ উত্তম ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সংসার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিবে এবং বর্ত্তমান অভাব অনটনের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। বাংলার আহমদি ভ্রাতাদের এ দিকে আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশাকরি প্রত্যেক সঙ্গতিসম্পন্ন ভাই অবশ্যই এই ছওয়াবের কাজ হইতে বঞ্চিত হইবেন না এবং স্ব স্ব আঞ্জুমানে চাঁদা দান করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(আল-ফজল, ৫ই আগষ্ট ১৯৫৪ সংখ্যায় প্রকাশিত নাজারতে তালীম তরবীয়তের বিজ্ঞপ্তি হইতে অনুদিত)।

খাকছার—মহম্মদ বদিউজ্জমান ভূঞা
জেনারেল সেক্রেটারী, ই, পি, এ,এ

প্রাদেশিক শোরা ও সালানা জলসা

আগামী ২১, ২২, ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৫ তারিখে প্রাদেশিক মজলিসে শোরা ও সালানা জলসার দিন ধার্য্য হইয়াছে। এসম্বন্ধে বিস্তারিত প্রোগ্রাম পরে জানান হইবে। শোরাতে প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী, মোবাল্লিগ ও এইজন্য বিশেষভাবে দাওয়াত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণই যোগদান করিতে পারিবেন। জলসাতে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলই যোগদান করিতে পারিবেন। মহিলাদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা হইবে। মেহমানদের খাওয়া ও থাকার বন্দোবস্ত কর্তৃপক্ষ করিবেন। সকলকেই নিজেদের বিছানাপত্র সাথে আনিবেন নতুবা এই শীতের দিনে অযথা কষ্টভোগ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে নিম্ন স্বাক্ষর সাথে পত্রাদি লিখিতে পারেন।

খাকছার—মহম্মদ বদিউজ্জমান ভূয়া
জেনারেল সেক্রেটারী, ই, পি, এ, এ
৪নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। পাক্ষিক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া যে কেহ ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.